তাবলীগ-১৬

দ্বীন শিখিয়ে

সম্মানী গ্রহণ কি নাজায়েয !

রচনা
মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

বইয়ের শেষাংশে রয়েছে

মাসিক আল কাউসারে প্রকাশিত
একটি গুরুত্বপূর্ণ তাহকীক

দ্বীন শিখিয়ে সম্মানী গ্রহণ কি নাজায়েয?

[মাদরাসায় পড়িয়ে বা দ্বীন শিখিয়ে সম্মানী গ্রহণ করা কি সাওয়াবের পরিপন্থী? হায়াতুস সাহাবার একটি বর্ণনার বিশ্লেষণসহ মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেবের আরো কিছু আপত্তিজনক ও বিভ্রান্তিকর বয়ানের ইলমি নিরীক্ষণ]

অর্পণ

মাওলানা শাহরিয়ার মাহমুদ

নিভৃতচারী এই দ্বীনদরদি আলেমে দ্বীনকে
আল্লাহ নেক হায়াত দান করুন,
তাঁর মেহনতের উত্তম বিনিময় দিন।

অনুবাদকের কথা

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি সাহেব ভারতের ঐতিহাসিক দ্বীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌতে হাদিস ও ফেকাহর উসতায হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁকে ভারতের অন্যতম বিচক্ষণ, ভারসাম্যপূর্ণ মেজাযের অধিকারী, উম্মাহর জন্যে ব্যথিত অন্তর লালনকারী ও সাহিবে দিল বুযুর্গ মনে করা হয়। তিনি দীর্ঘ দিন হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ সিদ্দিক আহমদ বান্দাবি রহ. এর সংশ্রবে ছিলেন, তাঁর তত্ত্বাবধানে আত্মশুদ্ধির মেহনত করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেছেন।

মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরের শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস রহ. মুফতি সাহেবের জ্ঞানলব্ধ বইগুলো দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর রচনাবলির ওপর আস্থা জানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে হযরতের এই মূল্যায়ন মাওলানার শেকড়স্পর্শী অধ্যয়ন, বিস্তৃত ইলম ও পোক্ত প্রজ্ঞার প্রমাণ বহন করে।

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. মুফতি যায়দ সাহেবের গবেষণালব্ধ রচনাবলি পড়ে আন্তরিক প্রীতি জানিয়েছেন।

শায়খুল ইসলাম মাওলানা মুফতি তাকি উসমানি সাহেব তাঁর বিশ্ববিখ্যাত রচনা 'গায়রে সূদি ব্যাংকারি' গ্রন্থে মুফতি যায়দ মাযাহেরি সাহেবের প্রবন্ধ থেকে বিভিন্ন চয়নিকা উদ্ধৃত করেছেন।

মুফতি যায়দ সাহেবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যখনই কোনো বিষয়ে কলম ধরেন, তখন সেই লেখা অবশ্যই সমকালের আকাবির উলামা ও মাশায়েখের খেদমতে উপস্থাপন করেন এবং এক্ষেত্রে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ ও সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত স্বীকার করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি সাহেব সম্পর্কে তিনি এ পর্যন্ত যতগুলো প্রবন্ধ-নিবন্ধ-পুস্তিকা ও বই রচনা করেছেন, সেগুলোর প্রতিটিকেই তিনি উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে দ্বীনের খেদমতে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের সম্মতিতেই তিনি সেগুলোকে মুদ্রিত আকারে জনগণের সামনে উপস্থাপন করছেন।

মহান আল্লাহ তাঁর ইলম, আমল, হায়াত ও খেদমাতের মাঝে বরকত দান করুন। তাঁর কলমি খেদমতকে সমস্যাক্রান্ত উম্মাহর হিদায়াতের বাতিঘর বানিয়ে দিন। আমিন।

বক্ষ্যমাণ বইটি তাঁর অনবদ্য রচনা 'দ্বীন শিখিয়ে সম্মানী গ্রহণ কি নাজায়েয' বইটির সরল অনুবাদ। যা বর্তমান দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান সংকট ও মাওলানা সাদ সাহেবের আপত্তিকর বয়ানগুলোর খণ্ডন প্রসঙ্গে রচিত 'তাবলীগ সিরিজের' ১৬তম প্রকাশনা হিসেবে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। এ বইয়ে তার মাদরাসার বেতন সম্পর্কে উপস্থাপিত অভিযোগ ও বিভ্রান্তিকর বয়ানের অপনোদন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ লেখককে নেক হায়াত দান করুন। তাবলীগের চলমান সংকট থেকে উত্তরণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বইটিকে কবুল করে নিন এবং আমাদেরকে দ্বীনের দাওয়াতের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

-আবদুল্লাহ আল ফারুক

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين

পড়িয়ে বা শিখিয়ে সম্মানী-বিনিময় নেওয়া কি সাওয়াবের পরিপন্থী?

মাওলানা সাদ সাহেব ও তাবলীগের পুরাতন সাথীদের এ সমস্ত আপত্তিকর কথাবার্তার ফলে তাবলীগের সাধারণ সাথীদের মাঝে একটি কথা বেশ প্রচলিত। কথাটি তাদের মস্তিষ্কে খুব দৃঢ়ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। এমনকি সে কথা তারা যত্রতত্র বলে বেড়ায়। কথাটি হলো—

‘ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা সম্মানী গ্রহণ করা সওয়াব ও প্রতিদানের পরিপন্থী কাজ।’

তাদের মুখে প্রায়সময় এই মুখস্থ বুলি শোনা যায়—

‘হয় বিনিময়/সম্মানী গ্রহণ করো অথবা সওয়াব গ্রহণ করো। কেননা সওয়াব ও বিনিময় একসাথে একত্র হতে পারে না।’

তারা এ আয়াতটিকে স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে—

مَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝

দারুল উলূম দেওবন্দের দায়িত্বশীল উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে যেই ‘ওজাহাতি ঘোষণা’ প্রকাশ করেছিলেন এবং যে ঘোষণার ওপর দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল ইফতা বিভাগ (ইসলামি আইন বিভাগ)-এর সিলমোহরও লাগানো ছিল, সেই প্রকাশিত ঘোষণায় মাওলানা সাদ সাহেবের আপত্তিকর ও সংশোধনকাম্য মন্তব্যসমূহের তালিকায় এ কথারও উল্লেখ ছিল যে—

"اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے، زناکار لوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے"۔(ماخوذ از سعادت نامہ، ص:۲)

‘বিনিময়/সম্মানী গ্রহণ করে দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া দ্বীনকে বিক্রয় করারই নামান্তর। দ্বীন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণকারীদের আগেই জিনাকারী লোক জান্নাতে যাবে।’ (সায়াদতনামা থেকে সংকলিত)

একই বিষয়ে দলিল হিসেবে মাওলানা সাদ হযরত উমর রাদি. এর এই কথাটিকে পেশ করেন—

يَا اَهْلَ الْعِلْمِ وَ الْقُرْآنِ! لاَ تَأْخُذُوْا ثَمَنًا فَتَسْبِقُكُمُ الزُّنَاةُ اِلَى الْجَنَّةِ.

‘হে ইলম ও কুরআনের বাহকগণ, তোমরা ইলম ও কুরআনের মূল্য গ্রহণ করো না। অন্যথায় যেনাকারীরা তোমাদের পূর্বে জান্নাতে চলে যাবে।’ (সাআদতনামা থেকে সংগৃহীত। পৃষ্ঠা : ৬)

এটি হায়াতুস সাহাবার ৩য় খণ্ডের ৩৩৩ নাম্বার পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। হযরত উমরের এ কথাটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ইলমি নিরীক্ষণ সামনে আসবে।

এ কথাটির ওপর ভিত্তি করেই মাওলানা সাদ সাহেব তার বিভিন্ন আলোচনায় মাদরাসার শিক্ষক ও উসতাযদের সম্মানী গ্রহণ করাকে জিনাকারীদের উপার্জনের সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকেন। তারই ধারাবাহিকতায় একবার মাযাহিরে উলুম সাহারানপুরের এক আলোচনাসভায় মাওলানা সাদ সাহেব এ বিষয়ে কথা বলেন এবং দ্বীন শিখিয়ে বিনিময়/সম্মানী গ্রহণকারীদের কঠোর নিন্দা ও সমালোচনা করে

হযরত উমর রাদি. এর উক্ত বর্ণনাকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত উলামায়ে কেরাম ও বিশেষজ্ঞ মুফতিগণ তার এ আলোচনাকে বিভ্রান্তিকর সাব্যস্ত করেন। তাঁরা তার এ কথার ওপর প্রচণ্ড আপত্তি তোলেন। মাওলানা সাদ সাহেবের ওই বয়ান প্রত্যাখ্যান ও অপনোদন করে মাওলানা মুফতি শুয়াইব আহমদ সাহেব বাস্তাভি (মুফতি, মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর) একটি প্রবন্ধ লিখেন। তার প্রবন্ধটি মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেব দ্বিতীয়বার পর্যবেক্ষণ করার পর মাযাহিরে উলুম সাহারানপুর থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার ২০০৪ সালের নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করেন। যার পূর্ণ বিবরণ এ গ্রন্থে আসবে।

মূল কথা হচ্ছে, মাওলানা সাদ সাহেব ও তাবলীগের বড় বড় দায়িত্বশীলরা যখন বিভিন্ন মজলিশে এসব কথা খুব জোরদারভাবে বয়ান দিতে লাগল যে, 'মাদরাসার উসতাজদের কোনো বিনিময়/সম্মানী গ্রহণ করা ছাড়াই দ্বীন শেখানো প্রয়োজন। বিনিময় ও খোরপোষ গ্রহণ করে দ্বীন শেখানোতে কোনো সওয়াব নেই। কোনো পুণ্য নেই। এটা দ্বীনের কোনো খেদমতও নয়। দ্বীনের খেদমত ও তাবলীগ তো ওইটাই যেটা কোনো বিনিময় ছাড়া করা হয়। مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন— 'বিনিময় ও সওয়াব এক সাথে জমা হতে পারে না।'

তাদের এ ধরনের বয়ানের কারণে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে মাদরাসার উসতায, মুহাদ্দিস, মুফতিসহ অন্যান্য আলেম-উলামা ও মাদরাসার সাথে সম্পৃক্তদের সম্পর্কে একটি খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়। তারা মনে করে— "আমরা সাধারণ মুসলমান তাবলীগ জামাতে বের হয়ে দ্বীনের খেদমত করছি। নিজেদের ঈমান মজবুত করছি। আর মাদরাসার উসতাযরা মাদরাসায় পড়ান এবং তার বিনিময় নেন। এটা দিয়ে তাদের জীবনের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করেন। এজন্য তাদের মাদরাসায় পড়ানোটা দ্বীনি খেদমত নয়। একাজের জন্য তারা কোনো সওয়াবের অংশীদারও হবে না। কেননা এটাই তো তাদের জীবিকা সংগ্রহের মাধ্যম। যেমন আমরা জীবিকা আহরণ করি সরকারি চাকরি করে। ছুটি নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনের খেদমতে বের হই। দ্বীনের খেদমত করি। এভাবে মাদরাসাওয়ালাদেরও উচিত কোনো বিনিময় ছাড়া আল্লাহর রাস্তায় খেদমত করা। তারা যদি কোনো ধরনের বিনিময়/সম্মানী ছাড়া মাদরাসায় পড়ায় তবেই তো তাা দ্বীনের খেদমত হবে। তখনই তারা সওয়াবের ভাগীদার হবেন। বিনিময়/সম্মানী গ্রহণ করার কারণে তারা সওয়াবের অংশীদার হতে পারেন না এবং এটা দ্বীনের খেদমতও নয়। কেননা সওয়াব ও বিনিময় একসাথে জমা হতে পারে না।"

শত সহস্র তাবলীগী ভাই এ ধরনের বয়ান শুনে শুনে উপরিউক্ত মানসিকতা ও মনোভাব ধারণ করতে শুরু করেছে। এই মানসিকতা মাওলানা সাদ সাহেব ও তাবলীগের কিছু মুরুব্বির আপত্তিকর বয়ানের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুক। আমিন।

সাম্ভালের ইজতিমায় মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানের চয়িত অংশ

গত বৎসর ২০১৬ সালে সাম্ভালে অনুষ্ঠিত ইজতেমায় খাওয়াস (বিশিষ্ট নাগরিক) ও আলেমদের মজলিসে মাওলানা সাদ সাহেব বয়ান করেন। সেখানেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন—

> 'আলেমদের তিন কাজ করা উচিৎ। ১. দাওয়াত ২. শিক্ষাদান এবং ৩. ব্যবসা।'

তিনি বিনিময় বা সম্মানী গ্রহণ করে দ্বীন শেখানোকে নাজায়েয না বললেও এ কথার উপর জোর দেন যে,

> 'জীবিকার জন্য ব্যবসা করুন এবং কোনো বিনিময় ছাড়াই পড়ান।'

আলেমদেরকে তিনি নিজেদের ভেতরে جامعيت তথা 'সামগ্রিক পূর্ণতা' গড়ে তোলার প্রতি জোর দেন।

আর সেই 'সামগ্রিক পূর্ণতা'র ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন—

"আলেমরা তিনটি কাজ করবে। ১. দাওয়াত দেবে, ২. পড়াবে এবং ৩. ব্যবসা করবে।"

তিনি এটাও বলেন—

'আমার দৃষ্টিতে যে আলেমের মাঝে এই সামগ্রিক পূর্ণতা নেই সে অকর্মণ্য। এজন্য নিজের মধ্যে জামিইয়্যাত বা সামগ্রিক পূর্ণতা সৃষ্টি করো। অর্থাৎ তাবলীগ করা, দ্বীন শেখানো ও ব্যবসা করা, এ তিনটাকে গ্রহণ করো।'

আমরা মাওলানার বয়ানের চয়িত অংশ হুবহু তার ভাষাতেই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—

"عالم کے اندر جامعیت کا پیدا نہ ہونا یہ بڑے نکمّے پن کی بات ہے، جامعیت پیدا کرو، جامعیت ہوگی تو دین کے ہر شعبہ کو فائدہ ہوگا، جامعیت نہیں ہے تو یہ ایک کام کا ہو کر رہ جائے گا، اس لئے میں عرض کرتا ہوں جو سال سے فارغ ہو کر جاتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو تین کام جمع کرنا، تعلیم، دعوت اور کسب تجارت، تاکہ کسب سے دو کام کرو، ایک تو مستغنی ہو کر معلم بنو، مستغنی ہو کر معلم بنو، ایک بات، اور دوسرے اللہ کے راستے میں خرچ کرو خروج پر، اور امت کو دین کی تعلیم دو، جو تمہارے پاس اصل سرمایہ ہے۔

صحابہ کرام کی یہ خاص بات تھی کہ وہ تینوں چیزوں کو جمع کرتے تھے، دعوت، تعلیم اور کسب، صحابہ ان کو جمع کرتے تھے، ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم ان تین چیزوں کو جمع کریں، تعلیم، کسب اور دعوت، ان تین چیزوں کو جمع کرنا، حضرت نے حیاۃ الصحابہ میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے کہ صحابہ ان تین چیزوں کو کیسے جمع کرتے تھے؟ اور رہا اگر ضرورت ہے تو اس کی شریعت میں پوری گنجائش ہے کہ آپ راتب (تنخواہ) لیں" انتہی بلفظہ۔

"আলেমদের মাঝে সামগ্রিক পূর্ণতা সৃষ্টি না হওয়াটা অকর্মণ্যত্বের পরিচয় ও নিন্দনীয় বিষয়। নিজের মাঝে পূর্ণতা সৃষ্টি করুন। যদি আলেমরা নিজেদের ভেতরে পূর্ণতা সৃষ্টি করতে পারে তাহলে দ্বীনের প্রত্যেকটি শাখা উপকৃত হবে। যদি সামগ্রিক পূর্ণতা না আসে তাহলে এক কাজের কাজি হয়েই রয়ে যাবে। যারা সাল সম্পন্ন করে তাদেরকে আমি এ কথাই বলি যে, দেখুন! তিনটি জিনিস নিজেদের মাঝে জমা করুন। তাবলীগ করা, দ্বীন শিক্ষা দেওয়া ও ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করা। ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে দু' কাজ করবে– ১. অন্যের অমুখাপেক্ষী হয়ে শিক্ষক হবে। অন্যের অমুখাপেক্ষী হয়ে উসতায হবে। ২. আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নিজেই ব্যয় করবে এবং উম্মতকে দ্বীনের শিক্ষা দেবে, যা আপনাদের মূলধন।

সাহাবায়ে কেরাম রাদি.–এর বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা এ তিন গুণ জমা করতেন— তাবলীগ, দ্বীন শিক্ষা ও ব্যবসা। আমাদেরও কাজ হবে এটই যে, আমরাও এ তিন গুণ নিজেদের মাঝে জমা করব। সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এ তিনটি বিষয়কে কীভাবে জমা করতেন, সে ব্যাপারে আমাদের হযরত হায়াতুস সাহাবা গ্রন্থে রীতিমত একটি অধ্যায় দাঁড় করিয়েছেন। তবে হ্যাঁ! যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সম্মানী গ্রহণ করার সুযোগও শরিয়তে আছে।"

অন্যত্র তিনি বলেন—

"سب سے اہم یہ ہے کہ فارغ ہونے والے طلباء تینوں کام، دعوت، تعلیم اور تجارت ایک ساتھ کریں" (تحفۂ علم و دعوت، ص: ৫৮)

"সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে মাদরাসা থেকে ফারেগ (শিক্ষাবর্ষ সমাপনকারী) ছাত্ররা এ তিনটি

কাজ– দাওয়াত, তালিম ও ব্যবসা, এই তিন কাজ একসঙ্গো আঞ্জাম দেবে।” (তুহফায়ে ইলম ও দাওয়াত : ৫৭)

মোটকথা, মাওলানা সাদ সাহেব আলেমদেরকে কোনো বিনিময় বা সম্মানী ছাড়াই মাদরাসায় পড়ানো এবং জীবিকা নির্বাহ করার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি জোর দিয়ে থাকেন।

আওরঙ্গাবাদ ইজতিমায় আলেমদের মজমায় মাওলানার বয়ানের একটি চয়িত অংশ

অল্প কিছু দিন আগে আওরঙ্গাবাদ ইজতেমায় (তারিখ- ২৪, ২৫, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ই.) আলেমদের মাজমায় উন্মুক্ত বয়ানে মাওলানা সাদ সাহেব বলেন—

"میں سال لگانے والے علماء کو بہت تاکید کرتا ہوں واپس جانے کے وقت کہ پوری کوشش کرنا اس بات کی، اس چکر میں نہ رہنا کہ کوئی معقول تنخواہ ملے تو پڑھاؤ اس لئے کہ جب علم کو عمل تک پہنچانا سبب پر موقوف ہو جائے گا تو علم امت کے اس طبقہ تک محدود ہو جائے گا تو علم امت کے اس طبقہ تک محدود ہو جائے گا جن کے پاس سیکھنے یا سکھانے کے اسباب موجود ہوں، اس امت کے علماء کو علم امانت کے طور پر دیا گیا تھا اور یہ مزاج بنایا گیا تھا کہ کبھی علم کو بیچنا مت، کبھی علم کو بیچنا مت، اس کا مزاج بنایا گیا تھا۔

ابی ابن کعبؓ نے ایک بچہ کو قرآن سکھلایا اس کے باپ نے خوش ہو کر ہدیہ کے طور پر ایک کمان دے، کمان جہاد کا ایک آلہ ہے، ہم اللہ کا راستہ صرف خروج کو نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں ایک بچہ کو قرآن پڑھانا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اس نے خوش ہو کر کمان ہدیہ میں دے دی، جس میں معاملہ نہیں ہوا تھا یہ اس کمان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی لچکدار کمان کہاں سے لی، عرض کیا میں نے فلاں کے بچہ کو قرآن پڑھایا تھا اس نے خوش ہو کر ہدیہ میں دی ،آپ نے فرمایا کہ جہنم کے ایک ٹکڑے کا یہ قلادہ ہے۔ (حیاۃ الصحابہ، ص: ۲۵۴، ج: ۳)

میں نے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کمان دنیاوی اعتبار سے کسی کاک کی نہیں، صرف اللہ کے راستہ میں قتال میں تیر چلانے کے کام آئے گی،

اسی طرح ایک صحابی نے سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ایک شخص اللہ کے راستہ میں نکلتا ہے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے اور اس کے دین کو پھیلانے کے لئے، اور نکلنے کے زمانے میں ایک تیر کا ارادہ کر لیا کہ تیر بھی ملے، حالانکہ تیر آلہ قتال میں سے ہے، اور تیر چلانے کے فضائل آپ حضرات نے ....

“আমি সাল লাগানো আলেমদেরকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সঙ্গো বুঝাই। তাদের বলি, তোমরা এ মানসিকতা বানিয়ো না যে, কোনো উপযুক্ত সম্মানী পেলে পড়াবো। কেননা ইলম যদি আমল পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তাহলে এই ইলম উম্মতের এমন একটি বিশেষ শ্রেণির মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, যাদের কাছে ইলম শিক্ষা দেওয়া বা শিক্ষা নেওয়ার যাবতীয় মাধ্যম রয়েছে। অথচ এ ইলম উম্মতের আলেমদেরকে আমানত হিসেবে দেওয়া হয়েছে এবং আলেমদের মাঝে এ মন–মানসিকতা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা কখনো ইলমকে বিক্রি করবেন না। ইলম বিক্রি না করাই আলেমদের শান। এটা আলেমদের মেজায।

উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক শিশুকে কুরআন শিখিয়েছিলেন। শিশুর পিতা খুশি হয়ে তাকে একটি ধনুক উপহার দেন। ধনুক হলো জিহাদের একটি হাতিয়ার। আমরা শুধু খুরুজকেই আল্লাহর রাস্তা বলি না। বরং আমরা বলি একটি বাচ্চাকে কুরআন পড়ানো, এটিও আল্লাহর

রাস্তা। শিশুর পিতা খুশি হয়ে একটি ধনুক উপহার দেন। এই ধনুক দেওয়ার ব্যাপারে আগ থেকে কোনো পাকা কথাও ছিল না। তিনি এ ধনুক নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— 'আপনি এত চিকচিকে ধনুক কোথায় পেলেন?' উত্তরে তিনি বলেন– 'আমি এক বাচ্চাকে কুরআন পড়িয়েছি। তার পিতা খুশি হয়ে আমাকে উপহার দিয়েছেন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– এটি জাহান্নামের এক টুকরো গলাবন্দ।' (হায়াতুস সাহাবা : ৩/২৫৪)

আপনাদের কাছে আমার নিবেদনের বিষয় হলো, পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধনুক খুব বেশি উপকারী বস্তু নয়। এটি শুধু আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার সময় কাজে আসে।

একই ধরনের আরেকটি ঘটনা। এক সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এক ব্যক্তি আল্লাহর ঝাণ্ডা প্রতিষ্ঠিত করার নিয়তে আল্লাহর রাস্তায় বের হল। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর দ্বীন ছড়িয়ে দেওয়া। বের হওয়ার মুহূর্তে সে একটি তীর সংগ্রহ করার নিয়তও করে নিল। অথচ এই তীর হলো যুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার। আপনারা অনেকগুলো হাদিসের মাঝে তীর নিক্ষেপের ফযিলত পাঠ করেছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করা কত বেশি সাওয়াবের কাজ! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবির প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'ওই লোক দুনিয়া ও আখেরাতে এ তীরটি ছাড়া আর কিছুই পাবে না।"

জ্ঞাতব্য : এ প্রবন্ধ প্রায় আট মাস আগে লেখা। আওরঙ্গাবাদের ইজতেমায় মাওলানা সাদ সাহেবের সদ্যপ্রদত্ত বয়ানের অংশ পরবর্তীকালে সংযুক্ত করা হয়েছে।

এখন লক্ষ্য করুন, মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব প্রথমে বললেন, 'উম্মতের মন-মানসিকতা তৈরি করা হয়েছে যে, কখনও ইলম বিক্রি করবে না।' তারপর তিনি তার এ কথার পরবর্তী অংশ হিসেবে হযরত উবাই ইবনে কাব রাদি.সহ আরো কিছু সাহাবির ঘটনা বর্ণনা করলেন। যেই ঘটনাগুলোর মাঝে 'পড়ানোর বিনিময়ে শিক্ষককে প্রদত্ত বস্তুকে আজাবের অংশ বলা হয়েছে।'

মাওলানার এ ধরনের বয়ানের ফলে শ্রোতাদের মাঝে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। শ্রোতা সাল লাগানো আলেম হোক কিংবা সাধারণ লোক হোক, তাদের মনে এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে যে, দ্বীন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় নেওয়া, সম্মানী গ্রহণ করা ও খোরপোষ গ্রহণ করা জঘন্যতম অপরাধ। এসব সম্মানী/বিনিময়/ওযিফা জাহান্নামের আগুনের টুকরো। কেননা তিনি তার দাবীর পক্ষে দলিল হিসেবে যে হাদিসগুলো বয়ান করেছেন, সেগুলোর কারণে নির্ঘাত সবার অন্তরে এ মানসিকতাই সৃষ্টি হবে যে, দ্বীন ও কুরআন শিখিয়ে সম্মানী গ্রহণ করা জায়েয নয়। সম্মানীসহ দ্বীন শিক্ষা দেওয়াটা কোনো দ্বীনি খেদমত নয়। যার ফলশ্রুতিতে নির্ঘাত শ্রোতাদের অন্তরে আলেমদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা ও দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। তিনি তার এ ধরনের বয়ানের মাধ্যমে শ্রোতাদের মন-মগজে এ ধারণা চাপিয়ে দিচ্ছেন যে, মাদরাসার সম্মানীভুক্ত উসতায শিক্ষকরা আসলে কোনো দ্বীনি খেদমতই করেন না। সম্মানী নেওয়ার কারণে তারা সকলেই জাহান্নামের উপযোগী। দ্বীনের সত্যিকার খেদমত তো আমরা মুবাল্লিগ ও দাঈরাই করছি। আমরা কোনো সম্মানী ও বিনিময় ছাড়াই মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার মেহনত আঞ্জাম দিচ্ছি। মাওলানা সাদ সাহেবের এ ধরনের আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যের কারণে তাবলীগের লক্ষ লক্ষ সাথীর অন্তরে এ ধরনের মানসিকতা বদ্ধমূল হয়ে আছে। মনের সে কুধারণাই তাদের মুখ থেকে কুকথা হয়ে বেরিয়ে আসছে। যার বেশ কিছু নজির ইতোমধ্যে সবার সামনে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা এখানে শুধু একটি নজির তুলে ধরছি।

মাদরাসায় পড়ানোকে দ্বীনের কাজ মনে করাটাও অনেক বড় ধোঁকা

ঘটনাটি ঘটেছে সেই আওরঙ্গাবাদেই। দাওয়াত ও তাবলীগের এক যিম্মাদার ও স্থানীয় আমির সাহেব এ প্রসঙ্গে বয়ান করছিলেন। বয়ানের বিষয়বস্তু নিশ্চয়ই তিনি তাদের বড়দের কাছ থেকে শুনেই বয়ান করেছেন। যার ফলে সেই কথা ছড়িয়ে পড়েছে। এখন সাধারণ মানুষও সেই কথা তাদের নিজেদের বয়ানে বলা শুরু করেছে। আমরা হুবহু সেই যিম্মাদারের ভাষাতেই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি বলেন—

> "হযরত আবু হুরাইরা রাদি. ছিলেন মুফতিয়ে আজম (প্রধান মুফতি)। মদিনাতে দশজন মুফতি ছিলেন। তিনি তাদের সবার সর্দার। তিনি বলেন— যদি একবারও আল্লাহর রাস্তায় বেরুনোর তাকাযা পূরণ না করি তাহলে জীবন শংকায় পড়ে যাবে। ঈমানের ওপর আঁচ পড়ে যাবে।
>
> প্রত্যেক মানুষই তার সেক্টরে বসে বসে ভাবে যে, সে বুঝি দ্বীনের খেদমত করছে। হজরতজি (মাওলানা সাদ সাহেব) কিছু দিন আগে আলেমদের মাঝে বয়ান করছিলেন। একজন লোক দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা মাদরাসায় দ্বীন শিক্ষা দিই। দ্বীনের কাজ করি। মাওলানা সাদ সাহেব প্রশ্ন করেন, সম্মানী ছাড়া পড়াচ্ছেন? তিনি বললেন, 'না'। সাদ সাহেব বলেন, 'সম্মানী গ্রহণ করে পড়ানোকে কি দ্বীন বলে! সম্মানী নিয়ে পড়াচ্ছেন। এটাও কি দ্বীনের কাজ! দ্বীন আলাদা শাখা। আপনাকেও একবৎসর সময় লাগাতে হবে। আলেমদের জন্য এক সাল অনিবার্য।
>
> অনেকে মাদরাসায় পড়ানোকেও দ্বীনের কাজ মনে করে। এটা অনেক বড় আত্মপ্রবঞ্চনা ও প্রতারণা। তারা নিজের প্রয়োজন পূরণ করার জনেই মাদরাসায় পড়াচ্ছেন। তারা পড়ানোর মাধ্যমে নিজেদের জীবিকার প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। নিজের বাচ্চাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। তাদের নিজেদের সংসার আছে। ঘরে আত্মীয়–স্বজন আছে। (মনে রাখবেন,) নিজের প্রয়োজন পূরণ করার নাম হলো, শরিয়ত! এটাকে দ্বীন মনে করা অনেক বড় ধোঁকা। 'আমিও দ্বীনের কাজ করছি' এটা মনে করাও ধোঁকা। কোনো মানুষ নামাজ পড়ছে তো সে মনে করছে আমি দ্বীনদার। কোনো মানুষ মসজিদ নির্মাণ করে নিজেকে দ্বীনদার মনে করছে। আরে, মসজিদ তো এমন মানুষও নির্মাণ করে, যে কোনো দিন মসজিদে আসে না। বলুন, এমন লোকও কি কখনো মসজিদ বানিয়ে দেয়নি, যে কখনো মসজিদেই আসেনি। যারা কখনও মাদরাসায় আসেনি, এ ধরনের মানুষরাও কি মাদরাসায় লক্ষ লক্ষ টাকা পয়সা দেয় না!? অনেক হিন্দুও তো দান করে। মসজিদে টাকা–পয়সা দেয়। কিন্তু তাদের কাছে দ্বীন নেই।"

যেনতেন সাথী নয়; তাবলীগের এক বড় যিম্মাদার ও এলাকার আমির সাহেব উপরের কথাগুলো বয়ান করেছেন।

এ ধরনের বয়ানের কারণে তাবলীগের সাথীদের অন্তরে যেই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, আমি চেষ্টা করব, আমার এ বইয়ের মাধ্যমে তাদের অন্তর থেকে সেই ভুল ধারণা দূর করতে। বিষয়টি আমি যথাসম্ভব সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। তাবলীগের সাথীরা শুধু অন্তরে অন্তরে ধারণাই করছে না; বরং মুখে মুখে বলেও বেড়াচ্ছে যে, পড়ানোর জন্যে সম্মানী নিলে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। সওয়াব ও বিনিময় একসাথে জমা হতে পারে না। সুতরাং আলেমদের উচিৎ তাদের মাঝে এই সামগ্রিক দক্ষতা সৃষ্টি করা যে, তারা একসঙ্গে দ্বীনের দাওয়াত দেবে, পাশাপাশি মাদরাসায় পড়াবে এবং এ দুটোর সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করবে। যদি তারা এই তিন কাজ একসঙ্গে না করে তাহলে তারা অকর্মণ্য সাব্যস্ত হবে। যারা সম্মানী নিয়ে পড়াচ্ছে, তারা দ্বীনের কোনো খেদমতই করছে না। এই

পড়ানোর কারণে তারা কোনো সাওয়াব ও বিনিময়ের হকদার হবে না। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা দলিল-প্রমাণের আলোকে এই ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করব।

উলামায়ে কেরামের জন্যে সামগ্রিক পূর্ণতার সংজ্ঞা

মাওলানা সাদ সাহেব ও তাবলীগের আরো কিছু দায়িত্বশীলের এ কথাটি যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে এর পরিণতি দাঁড়াবে যে, আমাদের সমস্ত আকাবির যেমন, হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবি রহ., মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস কান্ধলভি রহ., মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ., শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ.সহ দারুল উলূম দেওবন্দ ও সাহারানপুরের সকল আকাবির সঠিক পদ্ধতিতে দ্বীনের খেদমত করেননি। কেননা তাঁরা সবাই মাদরাসা থেকে সম্মানী নিতেন। তাঁরা সওয়াব ও পুণ্যেরও হকদার হবেন না। কেননা মাওলানা সাদ সাহেব ও তার সমমনাদের মতানুসারে সওয়াব ও বিনিময়— এ দুটো এক জায়গায় একত্র হতে পারে না। আমাদের এ আকাবিররা তো তাহলে আজীবন অকর্মণ্যই রয়ে গেলেন! কেননা তাঁরা মাওলানা সাদ সাহেবের ভাষায় নিজেদের মাঝে ওই জামিয়িয়্যাত বা দ্বীন-দুনিয়া উপার্জনের সামগ্রিক দক্ষতা তৈরি করতে পারেননি! এই অপূর্ণতার কারণেই তারা পাঠদান ও শিক্ষকতার পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেননি!

এখন প্রশ্ন হলো, উলামায়ে কেরামদের জন্যে মাওলানা সাদ সাহেব সামগ্রিক যোগ্যতা ও অকর্মণ্য হওয়ার যেই মাণদণ্ড ঘোষণা করলেন, তা কি তার নিজস্ব আবিস্কার? এটি তার নিজস্ব ইজতিহাদ, না-কি তাঁর পূর্বে এ ধরনের কথাবার্তা আর কেউ বলেছেন?

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভি রহ. তো উলামায়ে কেরামের জন্যে জামিয়িয়্যাত বা সামগ্রিক পূর্ণতার সংজ্ঞা জানিয়ে এ কথা বলেছেন যে, 'ইলম আমল ও ইখলাস— এ তিনের সমন্বয়ে জামিইয়্যাত বা সামগ্রিক পূর্ণতা আসে। যার সারমর্ম হাদিসে পাকেও পাওয়া যায়– النَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَالِمُوْنَ الخ. অর্থাৎ শুধু দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার ওপর থেমে যাবে না; বরং দ্বীন শিক্ষাদানের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির ওপরও গুরুত্ব ও মনোযোগ দেবে। তার ইলম ও আমল, কথা-বার্তা, বাহ্যিক অবস্থা, ভেতরগত অবস্থা সবকিছু শরিয়ত ও সুন্নাহ অনুযায়ী হবে।

"ইলম, আমল ও ইখলাসের সমন্বয়ই একজন আলেমের জন্যে জামিয়িয়্যাত বা সামগ্রিক পূর্ণতা।" সামগ্রিক পূর্ণতার এই সংজ্ঞা আমাদের আকাবির মনীষীগণ বিশেষত হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভি রহ. নানা সময় নানা সুরতে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়েছেন। কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেব দেওবন্দ ও সাহারানপুরের আকাবিরের মতের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে একক ইজতিহাদ করেছেন। সাদ সাহেবের মতে, শিক্ষাদান, তাবলীগ করা ও ব্যবসা করাটাই আলেমের জন্যে সামগ্রিক পূর্ণতা। এর ব্যত্যয় হলে, সে নিকর্মা– অকর্মণ্য। আলেমদের উচিৎ কোনো বিনিময় ছাড়াই দ্বীন ও কুরআন-হাদিস পড়ানো। আর জীবিকা নির্বাহের জন্য পাঠদানের পাশাপাশি তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করবে।

এ বিষয়ে আমি প্রথমে কুরআন ও হাদিসের এমন কিছু সুস্পষ্ট নস বা নির্দেশনা প্রমাণ হিসেবে পেশ করব, যার মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কুরআন হাদিস পড়িয়ে সম্মানী গ্রহণ করাটা সওয়াব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। যদি কোনো আলেম সম্মানী নিয়ে পড়ান তাহলেও তিনি দ্বীনের খেদমত করছেন। এটাও ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তায় অবস্থান করা) এর প্রতিপাদ্য। তিনিও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন। শিক্ষাদান করাটাই ওই আলেমের একমাত্র আয় হওয়াটা তার সাওয়াবপ্রাপ্তির পথে অন্তরায় হবে না। এমনকি দ্বীন শিক্ষা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় خير المعاش তথা অন্যতম উত্তম জীবিকা। কাজেই তার সম্মানী

নেওয়াটা তার সাওয়াব ও প্রতিদান প্রাপ্তির পথে কখনই প্রতিবন্ধক নয়।

কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট নস বা নির্দেশনার পর আমি খোলাফায়ে রাশেদিনসহ বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করব। দ্বীনি খেদমাতের জন্যে বিনিময় গ্রহণ করাটা যে খুলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত, তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমাদের দায়িত্ব হলো, ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের ফুকাহায়ে কেরাম ও আমাদের পূর্বসূরিগণ, বিশেষত দেওবন্দ, সাহারানপুরের উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মাওলানা সাদ সাহেব ও তার সমমনা যিম্মাদারদের উপরোল্লিখিত বয়ানকে নিরীক্ষণ করা। তাদের এ ধরনের ভিত্তিহীন, অসতর্ক ও মনগড়া কথাবার্তার কারণে উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কী পরিমাণ অপধারণার শিকার হয়েছে, তা খতিয়ে দেখাও আমাদের কর্তব্য। তাবলীগের সাধারণ সাথীরা এখন অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘার শিকার হয়ে কীভাবে উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসা সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে! ঔদ্ধত্বপূর্ণ মন্তব্য করে বেড়াচ্ছে! নাউজুবিল্লাহ! এগুলো হলো নিযামুদ্দিন মারকাযের মিম্বার থেকে প্রচারিত কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্যেরই ফলাফল। আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করুক। কাজেই সেসকল যিম্মাদারের কর্তব্য হচ্ছে, তারা আগামীতে এ ধরনের বয়ান দেওয়ার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। অতীতে তারা যেসকল ভুল-ত্রুটি করে ফেলেছে, সেগুলোর সংশোধনের উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন।

বাস্তবতা হলো, তাবলীগের বর্তমান সময়ের কিছু যিম্মাদারদের কাছ থেকে এমন আরো বেশ কিছু কাণ্ড পরিলক্ষিত হয়েছে, যার ফলে বলা যায়, এই মেহনত তার মূল মানহাজ থেকে সরে গেছে। কেননা আমাদের তাবলীগি আকাবির, যথা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ. ও মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. কখনই এ ধরনের মনোভাব লালন করতেন না। তাঁরা কখনই আলেমদের জন্যে সামগ্রিক পূর্ণতার এমন উদ্ভট মানদণ্ড বয়ান করেননি। তাঁদের বয়ানে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর কোনো কথাই আসত না।

এখন আমরা আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন, হাদিস, খুলাফায়ে রাশিদিনের আমল, সাহাবায়ে কেরামের আমলসহ ফুকাহায়ে কেরামের বিশ্লেষণ এবং দেওবন্দ ও সাহারানপুরের আকাবির মনীষীদের কর্মপদ্ধতি আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

দ্বীনের খেদমত করে সম্মানী গ্রহণ করা খোদ কুরআন কারিমে প্রমাণিত

ইসলামি শরিয়তের বিধান হলো, দ্বীনি খিদমত আঞ্জাম দিয়ে সম্মানী নেওয়া সাওয়াব ও প্রতিদানের মোটেও পরিপন্থী নয়। এমনকি এটি তাওয়াক্কুল ও তাকওয়ারও পরিপন্থী নয়। এর পক্ষে সুস্পষ্ট দলিল হলো, দ্বীনের খেদমত করে সম্মানী নেওয়া খোদ কুরআন কারিম, হাদিসে রাসূল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রমাণিত। যদি এই বিনিময় গ্রহণ ইখলাসপরিপন্থী হতো, বা সাওয়াব ও পুরস্কারের পরিপন্থী হতো তাহলে কুরআন কারিমে এর প্রমাণ থাকতো না এবং খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এই সম্মানী গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করতেন। দেখুন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورة التوبة)

এ আয়াতে যাকাতের টাকা কোথায় কোথায় ব্যয় করা যাবে সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যাকাত ব্যয় করার খাত হিসেবে উক্ত আয়াতে عاملين على الصدقة এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাকাত উসুলের কাজে নিয়োজিত তাদেরকে বাইতুল মাল (রাজকোষ) থেকে সম্মানী দেওয়া হয়ে থাকে। এই খাতের বাইরে যাকাত ব্যয়ের বাকি যে খাতগুলো আছে, সেই খাতগুলোতে অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হয়; কিন্তু عاملين على الصدقة কে অর্থাৎ যারা যাকাত উত্তোলন করেন তাদেরকে তাদের কর্মের বদলাতেই যাকাত থেকে সম্মানী দেওয়া হবে। এ কারণেই মাসআলা এসেছে যে, যাকাত উসুলকারীগণ যদি ধনীও হন তবুও তাদেরকে তাদের সম্মানী যাকাতের অংশ থেকে দেওয়া যাবে। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হলো, সাইয়্যেদগণ। যেহেতু যাকাতের অর্থের মাঝে সদকা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, এজন্যে তা সাইয়্যেদদের[৩] জন্য নিষিদ্ধ। যদিও এর বিপরীতে ইমাম তহাবী রহ.সহ বেশ কিছু ফকিহ, মুহাদ্দিস এটিকে খালিস পারিশ্রমিক বিবেচনা করে সাইয়্যেদদের জন্যেও গ্রহণ করা জায়েয অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন হলো, কী কারণে বিনিময় গ্রহণ করাটা যাকাত উসুলকারীদের অধিকার? ফুকাহায়ে কেরাম এই অধিকারের কারণ হিসেবে বলেছেন যে, তারা এ কাজের নিয়োজিত। অন্যসব কাজ থেকে তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে এনে স্রেফ এ কাজেই সময় ব্যয় করে থাকেন। এ কারণে তারা আর্থিক বিনিময়ের হকদার হবেন। ফকিহগণ ও মুহাদ্দিসগণ এ কারণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আমরা কয়েকটি রেফারেন্স তুলে ধরছি—

ইমাম নববি রহ. انَّ الصَّدقَةَ لاَ يَنْبَغِيْ لِآلِ مُحَمَّدٍ হাদিসের ব্যাখ্যায় যে কথাগুলো লিখেছেন, তা শায়খ উসমানি রহ. তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে নকল করেছেন। নববি রহ. লিখেছেন—

‘এ হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, যাকাত সাইয়্যেদদের জন্য হারাম। তারা গরিব, যাকাত

[৩] এখানে সাইয়্যেদ বংশ বলে হযরত মুহাম্মদ স. এর বংশকেই বোঝানো হয়েছে।

উসুলকারী, মিসকিন কিংবা কুরআনে বর্ণিত আট প্রকার লোকদের মধ্য থেকে যদি কোনো এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তা সত্ত্বেও সাইয়্যেদদের জন্য যাকাত হারাম। আর এটাই সহিহ। শায়খ উসমানী মুসলিম শরিফের শরাহতে[২] বলেন— এর বিপরীতে ইমাম তহাবি রহ. প্রমুখ যাকাত উসুলের কাজে নিয়োজিত সাইয়্যেদদের জন্যে যাকাতের অর্থ থেকে সম্মানী গ্রহণ করাকে জায়েয বলেছেন। কেননা এটা তাদের কর্মের পারিশ্রমিক মাত্র।

ইবনে আবিদিন বলেন— হাশেমি গোত্রের কোনো লোক যদি যাকাত উসুলের কাজে নিয়োজিত থাকে তাহলে তার জন্যে যাকাত থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে না। এজন্যে যে, পঙ্কিলতার সন্দেহ থেকেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার যেন পবিত্র থাকে।' (মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল মুসলিম : ৩/১০১, অধ্যায় : তাহরিমুয যাকাতে আলা রাসুলিল্লাহ স.)

আল্লামা কাসানি লিখেছেন—

'আমাদের মতে যাকাত উসুলকারী ব্যক্তি যে বিনিময় পেয়ে থাকেন তা তার কর্মের পারিশ্রমিক মাত্র। এমনটা নয় যে, তাদেরকে যাকাত দেওয়া হচ্ছে। এর পক্ষে প্রমাণ হলো, যাকাত উসুলকারী ব্যক্তি ধনী হলেও তিনি সর্বসম্মতিক্রমে এ পারিশ্রমিকের উপযুক্ত। যদি এটি সদকা হতো তাহলে তা ধনীদের জন্য বৈধ হতো না। (আল বাদাইয়ুস সানাইয়ু : ২/৪৪)

আল্লামা ইবনে নুজাইম বলেন—

যাকাত উত্তোলনকারী ধনীদেরকে তাদের উত্তোলনকৃত যাকাতের অর্থ থেকে তাদের কর্মের পারিশ্রমিক দেওয়া অবশ্যই জায়েয। যদিও তাদের জন্য সদকা–যাকাত হারাম। কেননা তারা যাকাত উসুলের কাজে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিল।[৩] কাজেই তারা পরিমাণমাফিক পারিশ্রমিকের হকদার। সুতরাং প্রয়োজনীয় খরচের অর্থ যাকাত থেকে গ্রহণ করতে তাদের জন্য বাধা নেই। যেমনটা মুসাফিরেরও বিধান। (আল বাহ্রুর রায়েক, যাকাতের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র : ২/৪২)

বাস্তবতা হলো, যাকাতের এ অর্থগুলো একদিকে বিনিময়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে। আবার অন্যদিকে সদকার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। তাই প্রথম সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে যাকাত উসুলকারীর জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ। আর দ্বিতীয় সাদৃশ্যের কারণে এ অর্থ হাশেমী বংশের বংশধরদের জন্য বৈধ নয়। (আল বাহরুর রায়েক : ২/৪২১)

উপরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে সুস্পষ্ট বুঝে আসছে যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যাকাত উসুলের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে তার কাজের বদলায় যে অর্থ দেওয়া হয়, তা তার কর্মেরই পারিশ্রমিক। এ অর্থকে শরিয়তের পরিভাষায় 'উমালা' বলে। কুরআনও যাকাত উসুলকারীদেরকে 'উমালা' অর্থাৎ তাদের কাজের বিনিময় দেওয়ার নির্দেশ করেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কুরআনের এ নির্দেশ অনুসারে আমল করেছেন। সেমতে দেখা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উমর রাদি.-কে যাকাত উসুলের কাজে প্রেরণ করেন তখন তাঁকে তাঁর কাজের বিনিময় দেন। কিন্তু উমর রাদি. সেই বিনিময় গ্রহণ করতে প্রথমে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো কাজগুলো করেছি সওয়াবের আশায়।

---

[৪] ব্যাখ্যাগ্রন্থ

[৫] তারা নিজেদেরকে অন্যান্য কাজ থেকে বিরত রেখে যাকাত উত্তোলনের কাজে ব্যস্ত রেখেছেন। রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে তারা জীবিকার ব্যবস্থা করার সুযোগ পাননি। তাই তাদেরকে এ কাজের বিনিময় দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টা এমন নয় যে, তারা গরিব অসহায় বলেই তাদেরকে এ বিনিময় দেওয়া হচ্ছে। বরং যাকাত উসুলকারী যদি ধনীও হয় তাহলেও এ বিনিময় তার জন্য বৈধ।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদি.-কে জোর করেই এই পারিশ্রমিক প্রদান করেন।

পরবর্তীকালে উমর রাদি. যখন তার খেলাফতকালে ইবনুস সায়েদি মালেকিকে যাকাত উত্তোলনের কাজে পাঠান, সেসময়ও তিনি তাকে তার কাজের বিনিময় দিয়েছিলেন। তিনিও তখন বিনিময় গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন। উমর রাদি. খানিকটা জোর করে তার হাতে তার কাজের পারিশ্রমিক/সম্মানী তুলে দেন। যেমনটি মুসলিম শরিফের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়—

> ইবন্‌স সায়েদি আল মালিকি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– উমর রাদি. যাকাত উত্তোলনের কাজে আমাকে নিয়োগ দেন। যখন আমি কাজ সম্পন্ন করে যাকাতের অর্থ তাঁকে বুঝিয়ে দিই তখন তিনি আমাকে এর বিনিময় গ্রহণ করার জন্য আদেশ করলেন। আমি বললাম– আমি তো কাজগুলো করেছি আল্লাহর জন্য। এর বদলা আমি আল্লাহর কাছ থেকেই নেব। তখন তিনি বলেন, 'আমি আপনাকে যা দিচ্ছি, নিঃশঙ্কোচে গ্রহণ করুন। কেননা আমিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যাকাত উত্তোলনের কাজ করেছিলাম। তখন তিনিও আমাকে পারিশ্রমিক/সম্মানী প্রদান করেন। সেসময় আমিও আপনার মতো সম্মানী গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম। তখন আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যখন তোমার না চাওয়া সত্ত্বেও কোনো কিছু তোমাকে দেব, তখন তা নিঃশঙ্কোচে গ্রহণ করবে। সেই বস্তু খেতেও পারবে, অন্যকে দানও করতে পারবে। (সহিহ মুসলিম, যাকাতের অধ্যায়, হাদিস নং : ২৪০৫)

ইমাম নববি বলেন, এ বর্ণনায় উমর রাদি. عمالة (উমালা) শব্দ ব্যবহার করেছেন। উমালা বলা হয় সেই পারিশ্রমিককে, যা যাকাত উসুলকারীদেরকে তাদের কর্মের পারিশ্রমিক/সম্মানী হিসেবে দেওয়া হয়। (মুসলিম শরিফ, যাকাতের অধ্যায় : ১/৩৩৫)

এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, যাকাত উসুলকারীদেরকে যেই বিনিময় দেওয়া হয়, সেটাকে সকল ফকিহ ও মুহাদ্দিস 'উজরত' বা 'পারিশ্রমিক' নাম দিয়েছেন। আর যাকাত উসুলকারীদেরকে তাদের কাজের পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রচলন যদি শরিয়তে প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে কারো পক্ষে কি এ দাবি তোলা সম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম তাকওয়া ও তায়াক্কুলের পরিপন্থী কাজ করেছেন! কোনো যুক্তিতেই তাঁদের সেই কাজ আপনি সাওয়াব ও পরকালীন বিনিময়শূন্য বলতে পারেন না।

কারণ হলো, এই (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) যাকাত উসুলকারীদেরকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম كالغازي في سبيل الله অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদকারী গাজির সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। যার অর্থ হলো, মুজাহিদরা যেমন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে সাওয়াব পাবে, তেমনই এই যাকাত উত্তোলনকারীও তার কর্মের জন্যে সাওয়াব পাবে। সেমতে তিরমিযি শরিফের বর্ণনায় এসেছে—

> সাইয়্যেদুনা রাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যাকাত উত্তোলনকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মতই, যতক্ষণ না সে তার বাড়িতে ফিরে আসে। (তিরমিজি শরিফ : ৬৪০)

দেখুন, ওই যাকাত উত্তোলনকারী যিনি নিজ কাজের সম্মানী গ্রহণ করে দ্বীনের কাজ করছেন তার ব্যাপারেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তার সওয়াব আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদের সওয়াবের মতই।

আল্লামা ইবনুল আরাবি রহ. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

> সদকা উত্তোলনকারী আমেল জিহাদকারী গাজির স্থলাভিষিক্ত। কেননা তিনি আল্লাহর পথের মালগুলো জমা করেন। কাজেই একজন তার আমলের মাধ্যমে গাজি, আর অপরজন তার

> নিয়তের মাধ্যমে গাজি।... যুদ্ধ করা যেমন প্রয়োজন, তেমনই সেই সম্পদও প্রয়োজন, যা যুদ্ধের কাজে ব্যবহার্য্য। কাজেই গাজি ও সদকা উত্তোলনকারী, উভয়ে যখন নিয়তের মাঝেও শরিক, আমলের মাঝেও শরিক, সে ভিত্তিতে সাওয়াবের মাঝেও তাদেরকে অবশ্যই শরিক করতে হবে। (তিরমিজি শরিফ : ৬৪০। তুহফাতুল আহওয়াজি : ৩/২৪৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত হাদিস থেকে এ কথা সুনিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, সম্মানী ও পারিশ্রমিক গ্রহণ করার পরও যাকাত উত্তোলনকারী আল্লাহর কাছে সাওয়াব ও পরকালীন বিনিময়ের হকদার হবেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত উত্তোলনকারীকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী গাজির সমান সাওয়াবের হকদার ঘোষণা করেছেন। যখন সেই যাকাত উত্তোলনকারী সুনিশ্চিতভাবে তাঁর নিজ কাজের পারিশ্রমিক নিচ্ছে এবং তার কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করাটা কুরআন, হাদিস, নবিজির সীরাত ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মকাণ্ড থেকে প্রমাণিত, তখন কীভাবে কেউ এ দাবি করতে পারে যে, দ্বীনি কাজ করে সম্মানী নিলে পরকালে সাওয়াব পাওয়া যাবে না! তার এ দাবি নিঃসন্দেহে কুরআন, হাদিস ও সুন্নতের পরিপন্থী।

একটি সতর্ক বার্তা

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা অবশ্যই আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে। তা হলো, একমাত্র যাকাত উত্তোলনকারীদের বৈশিষ্ট্য হলো, তাদেরকে তাদের কাজের সম্মানী যাকাতের অংক থেকে দেওয়া যাবে। এর বাইরে অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার কর্মের বিনিময় হিসেবে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না। কোনো ইমামকে, কোনো মুয়াজ্জিনকে, কোনো মাদরাসা শিক্ষককে এমনিক কোনো মুজাহিদকেও যাকাতের অর্থ থেকে সম্মানী দেওয়া যাবে না। যাকাত ছাড়াও বাইতুল মাল অর্থাৎ রাজকোষের আয়ের আরো অনেকগুলো উৎস রয়েছে। সেই উৎসের অর্থ দিয়েই উপরোল্লেখিত ব্যক্তিদেরকে সম্মানী দেওয়া যাবে। সম্মানিত ফকিহগণ এ কথা সুস্পষ্টভাবে লিখে জানিয়েছেন।

দ্বীনের খেদমত করে বিনিময় নেওয়া উত্তম জীবিকা, এ কাজ সাওয়াবের পরিপন্থী নয়

মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এসেছে—

> হযরত আবু হুরাইরা রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জীবিকা হলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এমন মুজাহিদ, যে ঘোড়ার লাগাম মুঠোয় নিয়ে তার পিঠে চড়ে দৌড়ে বেড়ায়। কোথাও কোনো বিপদসংকুল বা গুরুতর পরিস্থিতির সংবাদ শুনলে ঘোড়ায় চড়ে, মৃত্যুর ভয় তুবড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে, শাহাদাতের বাসনা মনে চেপে ছুটে যায়। (মুসলিম : ৪৮৬৬)

এ হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, যেই মুজাহিদ সম্মানীভাতা নিয়ে যুদ্ধ করে, তার অবস্থা এমন যে, সে যুদ্ধের জন্যে অষ্টপ্রহর এতোটাই প্রস্তুত থাকে যে, কোথাও পরিস্থিতির বিপর্যয়ের সংবাদ শুনলে, বা যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠলে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সর্বক্ষণ চৌকান্না ও সতর্ক থাকে।

হাদিসের ব্যাখ্যাকারীগণ এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থোপার্জন ও জীবিকা সংগ্রহের যতগুলো মাধ্যম ও পন্থা রয়েছে, সেগুলোর মধ্য হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হলো জিহাদ। তবে শর্ত হলো, এই জিহাদের একক উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ, নিজ জিহাদের ক্ষেত্রে মুখলিস হতে হবে। তাইতো দেখা যায়, মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল মুলহিমের মাঝে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা কুরতুবি রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন—

‘অর্থোপার্জনের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো, জিহাদ। এটা তখনই হবে যখন জিহাদের ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করা।’ [ফাতহুল মুলহিম : ৯/৩৪৮]

কাজী ইয়াজ মালেকি রহ. বলেন,

এ হাদিস থেকে বুঝে আসে যে, অর্থোপার্জন ও জীবিকা সংগ্রহের নিয়তে জিহাদ করা ও মালে গনিমত উপার্জন করা সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কারের পরিপন্থী নয়; তবে শর্ত হলো, তার আসল উদ্দেশ্য জিহাদই হতে হবে। [ফাতহুল মুলহিম : ৯/৩৪৮]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে পবিত্র হাদিসের আলোকে স্পষ্টভাবে এই মূলনীতি বুঝে আসে যে, দ্বীনের যেকোনো খেদমত যদি বিনিময় গ্রহণ ও অর্থোপার্জনের নিয়তেও সম্পন্ন হয়, তারপরও এ নিয়তের কারণে ব্যক্তির সাওয়াব ও পরিকালীন প্রতিদানে কমতি আসবে না। অর্থোপার্জনের নিয়ত করা সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদানের পথে প্রতিবন্ধক নয়। বরং হাদিসের ভাষায়, সেটা خير المعاش অর্থাৎ সর্বোত্তম জীবিকার মর্যাদা পাবে।

এ কারণেই আমাদের সকল ফকিহ জিহাদকে জীবিকা উপার্জনের সবচেয়ে উত্তম পথ অভিহিত করেছেন। এর পরবর্তী স্তরে রেখেছেন ব্যবসা ও কারিগরি শিল্প ইত্যাদিকে। সেমতে ফতওয়ায়ে আলমগিরিতে এসেছে—

‘অর্থোপার্জনের সবচেয়ে উত্তম পন্থা জিহাদ। পরবর্তী স্তরে রয়েছে বাণিজ্য। তৃতীয় স্তরে রয়েছে কৃষিকাজ। আর চতুর্থ স্তরে হস্তশিল্প।’ (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি : ৫/৩৪৯)

আল্লামা ইবনে নুজাইম *আল বাহরুর রায়েক* গ্রন্থে বর্ণনা করেন—

‘উলামায়ে কেরাম বলেন, জিহাদের পর অর্থোপার্জনের সবচেয়ে উত্তম পন্থা বাণিজ্য। এরপর চাষাবাদ। এরপর হস্তবিদ্যা।’ (বাহরুর রায়েক : ৫/৪৩৯)

হাফেয ইবনে হজর আসকালানি রহ. তাঁর বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উপরের কথাগুলো খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তার দীর্ঘ আলোচনার সারমর্ম হলো, ‘জীবিকা উপার্জন ও অর্থসংগ্রহের যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলোর মাঝে সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো জিহাদ।’ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করবে আর এই জিহাদের কারণে সে যেই বিনিময় বা মালে গনিমত পাবে, সেটা দিয়ে জীবন যাপন করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র জীবন এভাবেই যাপন করেছেন। জীবিকা উপার্জনের সবগুলো পদ্ধতির মাঝে একমাত্র জিহাদই সর্বোত্তম পদ্ধতি ঘোষিত হওয়ার কারণ হলো, এর মাধ্যমে অর্থোপার্জনের পাশাপাশি একদিকে আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত হয়, অন্যদিকে ইসলামের শত্রুদের পরাজিত ও পরাস্ত করা সম্ভব হয়। এর পাশাপাশি এই জিহাদের কারণে পরকালে সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া যায়।’

আলোচনার ধারবাহিকতায় হাফেয ইবনে হজর রহ. বুখারি শরিফের باب كسب الرجل و العمل بيده শিরোনামের অধীনে লেখেন—

‘নিজ পরিশ্রমে অর্থ উপার্জনের যতগুলো পন্থা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো, জিহাদের মাধ্যমে কাফেরদের সম্পদ হস্তগত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম আজীবন এ অর্থ দিয়ে জীবন যাপন করেছেন। জিহাদ সর্বোত্তম উপার্জন হওয়ার কারণ হলো, এর মাধ্যমে একদিকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যদিকে আল্লাহর শত্রুদের বিনাশ হয়। এছাড়া আরো নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে।’ (ফাতহুল বারি : ৪/৩০৪)

শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব লেখেন—

বাহরুর রায়েক গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন যে, আমাদের হানাফি ফকিহগণের মতে জিহাদের পরে আয় উপার্জনের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে ব্যবসা। তারপর চাষাবাদ। এরপর কারিগরি শিল্প ও অন্যান্য পেশা। (ফাযায়েলে তিজারত : ৫১)

অর্থাৎ পেশাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম পেশা হচ্ছে ব্যবসা। তবে সেটা জিহাদের পরে। জিহাদের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা ব্যবসার চেয়েও উত্তম।

উপর্যুক্ত আয়াত, হাদিস, হাদিসের ব্যাখ্যা ও ফকিহগণের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, জিহাদের মাধ্যমে জীবিকা সংগ্রহ করা সবচেয়ে উত্তম পেশা। এই অর্থ গ্রহণ করা মুজাহিদদের সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কার প্রাপ্তির পথে কখনই অন্তরায় নয়। এ কারণে হযরত উমর রাদি. তাঁর খেলাফতকালে সকল মুজাহিদের জন্য সম্মানী নির্ধারণ করেছিলেন। কারণ, তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, জিহাদের বিনিময় গ্রহণ করা ও জিহাদের কারণে সম্মানী গ্রহণ করা মুজাহিদের সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কার লাভের অন্তরায় নয়।

আল্লামা শিবলি রহ. তাঁর কিতাব 'আল ফারুক'-এর মাঝে সেই ইতিহাস সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। নিম্নে আমরা স্রেফ সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি—

"তারপর হযরত উমর রাদি. সম্মানী বাড়ানোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কেননা তিনি সৈন্যদেরকে চাষাবাদ, ব্যবসাসহ সব ধরনের পেশাভিত্তিক ব্যস্ততা থেকে কঠোর হস্তে সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখতেন। যার ফলে তাদের সকল প্রয়োজন বাইতুল মাল থেকে নিষ্পন্ন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। সেই ভাবনা থেকেই তিনি তাদের বেতনের অংক যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। যাদের সর্বনিম্ন সম্মানী দু'হাজার ছিল তাদের সম্মানী বাড়িয়ে তিন হাজার করেন। অন্যান্য কর্মকর্তার সম্মানী সাত হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন।" (আল ফারুক : ২৩৩)

'এভাবে নিয়মিত বিরতিতে জৈষ্ঠ্যতা ও কর্মনৈপুণ্যের ভিত্তিতে সবার সম্মানী ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কাদিসিয়া যুদ্ধে যোহরা, ইসমাহ প্রমুখ বড় ধরনের অনেকগুলো বীরত্বপূর্ণ কীর্তি দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন, এজন্যে তাদের পূর্বের ২ হাজার দেরহামের সম্মানী বাড়িয়ে আড়াই হাজার নির্ধারণ করেন। নির্ধারিত সম্মানী–ভাতার বাইরে বিভিন্ন সময় যেসব মালে গনিমত হস্তগত হতো, সেগুলো তিনি র‍্যাংক ও পদমর্যাদা অনুসারে সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করতেন। যার কোনো শেষ সীমা ছিল না। তাইতো দেখা যায়, জালুলা যুদ্ধে একেকজন অশ্বারোহী নয় হাজার দিরহাম, নিহাওয়ান্দ যুদ্ধে ছয় হাজার দিরহাম করে অংশ পেয়েছিল।' (আল ফারুক : ২৩৫)

'সম্মানী বণ্টনের নিয়ম ছিল—প্রতিটি গোত্রের জন্যে একজন করে সর্দার নির্ধারণ ছিল। ন্যুনতম প্রতি দশজন সেপাহির জন্যে একজন করে সামরিক কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিল। এই কর্মকর্তাদেরকে উমারাউল আশার (দশজনের নেতা) বলা হতো। প্রথমে সম্মানী তাদের হাতে তুলে দেওয়া হতো। তারা সেগুলো গোত্রের সর্দারদের হাতে সোপর্দ করতেন। গোত্রের সর্দাররা নিজ নিজ গোত্রের সেনাদের মাঝে তা বণ্টন করতেন। একেকজন সর্দারের জিম্মায় এক লাখ দিরহাম করে বণ্টিত হতো। কুফা ও বসরা নগরাতে এমন একশো জন সর্দার ছিল। যাদের মাধ্যমে এক কোটি দিরহাম বণ্টন হয়েছে।" (আল ফারুক : ২৩৪)

'মোটকথা, উপরিউক্ত নির্দেশনার আলোকে একটি রেজিস্ট্রার তৈরি করা হয় এবং নিম্নে বর্ণিত ধারা অনুপাতে সম্মানী নির্ধারিত হয়—

১. যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের জন্য পাঁচ হাজার।

২. হাবশার মুহাজিরিন ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে চার হাজার।

৩. মক্কাবিজয়ের পূর্বে যারা হিজরত করেছিলেন তাদের জন্য তিন হাজার।

৪. যারা মক্কাবিজয়ের সময় ঈমান গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য দু'হাজার।

৫. যারা কাদিসিয়া ও ইয়ারমুকের যুদ্ধে শরিক ছিলেন তাদের জন্য দু'হাজার।

৬. ইয়ামনবাসীদের জন্য চারশো দিরহাম।

৭. কাদিসিয়া ও ইয়ারমুকের যুদ্ধের পরবর্তী যুদ্ধগুলোর মুজাহিদদের জন্য তিনশো দিরহাম।

৮. সাধারণদের জন্য দু'শো দিরহাম। (আল ফারুক : ২২৪)

হযরত ইমাম মুসলিম রহ. হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি একটি বিধান জারি করেছিলেন। বিধানটি ছিল, জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদের বয়স যদি অন্যূর্ধ্ব পনেরো হয় তাহলে তিনি সম্মানী-ভাতার যোগ্য বিবেচিত হবেন। এরচেয়ে কম বয়স হলে সম্মানী-ভাতার যোগ্য বিবেচিত হবেন না। সেমতে মুসলিম শরিফে এসেছে—

> "হযরত নাফে রহ. বলেন, আমি উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ.–এর দরবারে হাজির হলাম। তখন তিনি খলিফা। আমি তাকে এ হাদিস বর্ণনা করলাম যে, (ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি উহুদের জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলাম। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ। আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো না। তারপর আমি খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন করলাম। তখন আমার বয়স ছিল পনের। এসময় আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো।) তিনি বললেন– 'এটাই ছোট ও বড়র মাঝে সীমারেখা'। এ কথা বলে তিনি তাঁর গভর্নরদের কাছে এ ফরমান লিখে পাঠালেন যে, যাদের বয়স পনের তাদের জন্য সম্মানী নির্ধারণ করুন। আর যাদের বয়স পনেরো থেকে কম তাদেরকে তাদের পরিবারের সাথে অন্তর্ভুক্ত করুন। (মুসলিম শরিফ, কিতাবুল ইমারাতি, বাবু বয়ানি সন্নিল বুলুগ : ৪৮১৪, ফাতহুল মুলহিম : ৯/৪৬৩)

এখানে লক্ষ্যণীয় হলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেদমত ও অনেক বড় ইবাদত। জিহাদ এত বড় ইবাদত যে, লাইলাতুল কদরে পবিত্র মক্কা শরিফে হাজরে আসওয়াদের সামনে ইবাদত করার চেয়েও সামান্য সময়ের জন্যে জিহাদে অবস্থান করা অনেক বেশি উত্তম। সেমতে ইবনে হিব্বানের বর্ণনায় এসেছে–

> 'কিছু সময় আল্লাহর রাস্তায় অবস্থান করা লাইলাতুল কদরে হাজরে আসওয়াদের সামনে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।'

কাজেই যখন জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্যে বিনিময় নেওয়াটা পুরস্কার ও পরকালীন প্রতিদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়; এজন্যেই তো হযরত উমরে ফারুক রাদি. ও হযরত উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. মুজাহিদদের জন্যে সম্মানী-ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন, তাহলে দ্বীনের অন্যান্য খেদমত, যথা মাদরাসায় পড়ানো ও দ্বীন শেখানোর জন্যে সম্মানী নেওয়াটা কেন আল্লাহর পুরস্কার, সাওয়াব ও প্রতিদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে! কোন দলিলের ভিত্তিতে আপনি এ সম্মানীকে সাওয়াবের পরিপন্থী দাবি করছেন!

মাদরাসায় পড়ানো ও দ্বীন শেখানোও জিহাদের অংশ

ইসলামি শরিয়তে জিহাদের অনেকগুলো প্রকার ও ক্ষেত্র রয়েছে। দ্বীন শেখা-শেখানো, দ্বীনি ইলম পাঠদান, এগুলোও জিহাদের একটি অংশ। স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ. (مشكوة, كنز العمال : ١٠٨٧١)

‘মুশরিকদের সাথে জিহাদ করো নিজের জান, মাল ও বাকশক্তি দ্বারা।’ (মিশকাত শরিফ, কানযুল উম্মাল, পৃষ্ঠা : ১০৮৭১)

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. জাদুল মা‘আদ গ্রন্থে এবং হাদিসের ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার রহ. ও মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ. প্রমূখ জিহাদের বিভিন্ন প্রকার ও ক্যাটাগরির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা জিহাদের বিভিন্ন প্রকারের যেই বিবরণ দিয়েছেন, সেগুলোর মাঝে পাঠদান, অধ্যাপনা ও তাবলীগকেও জিহাদের অন্যতম প্রকার বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন—

“শরিয়তের পরিভাষায়, কাফেরদের বিরুদ্ধে সংঘাতে শক্তিপ্রয়োগ করাকে জিহাজ বলা হয়। এর পাশাপাশি নফসের বিরোধিতা, শয়তানের বিরোধিতা ও দুষ্কৃতিকারীদের বিরোধিতা করাকেও জিহাদ বলা হয়। নফসের বিরোধিতার জিহাদ হলো, দ্বীন শেখা, দ্বীন শিক্ষা দেওয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা। আর শয়তানের বিরোধিতার জিহাদ হলো, দ্বিধা–সংশয় ও রিপুর তাড়না প্রতিহত করা। আর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ সংঘটিত হয় হাত, সম্পদ, বাকশক্তি ও অন্তর দিয়ে। আর দুষ্কৃতিকারীদের বিরোধিতার জিহাদ সংঘটিত হয় হাত, বাকশক্তি ও অন্তর দিয়ে।” (ফতহুল বারি : ৬/৩, বাযলুল মাজহুদ, কিতাবুল জিহাদ, পৃষ্ঠা : ৪০০, খণ্ড : ৩, ভারতীয় সংস্করণ)

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. জাদুল মা‘আদ গ্রন্থে আরো সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাজি রহ. জিহাদের সবগুলো প্রকারের মধ্য থেকে ইলমি বা জ্ঞানভিত্তিক জিহাদকে কিছু কিছু দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোত্তম অভিহিত বলেছেন। কেননা জিহাদের সবগুলো প্রকার এই ইলমি জিহাদের ওপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন—

فإن قيل : فأي الجهادين أفضل؟ جهاد النفس والمال أم جهاد العلم؟ قيل له : الجهاد بالسيف مبني على جهاد العلم وفرع عليه، لأنه غير جائز أن يعدوا في جهاد السيف ما يوجبه العلم، فجهاد العلم أصل، وجهاد النفس فرع، والأصل أولى بالتفصيل من الفرع. (أحكام القرآن، صـ ١١٩، جـ: ٣)

“যদি প্রশ্ন ওঠে, কোন প্রকারের জিহাদ উত্তম? নফসের ও সম্পদের জিহাদ উত্তম, না–কি ইলমের জিহাদ? এর উত্তরে বলা যায়, তলোয়ারের মাধ্যমে জিহাদের ভিত্তি হলো ইলমি জিহাদের ওপর। এটা তারই প্রশাখা। কেননা ইলমই স্বশস্ত্র যুদ্ধের গতি–প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। সুতরাং ইলমের জিহাদ মূল। আর নফসের জিহাদ ইলমের জিহাদের শাখা। আর নিয়ম হলো, মূল সবসময় শাখার তুলনায় অধিক উত্তম হয়ে থাকে।” (আহকামুল কুরআন : ৩/১১৯)

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাযি রহ. এর সিদ্ধান্ত অনুসারে তো, তা‘লিম ও তা‘আল্লুম অর্থাৎ ইলমে দ্বীন শেখা ও শেখানো কিছু কিছু দৃষ্টিকোণ থেকে স্বশস্ত্র যুদ্ধের চেয়েও উত্তম। কেননা জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার

হচ্ছে স্বশস্ত্র জিহাদ। আর সেই স্বশস্ত্র জিহাদ ইলমে দ্বীনের ওপরই নির্ভরশীল। কাজেই স্বশস্ত্র জিহাদটা শাখা আর ইলমি জিহাদ মূল নিরুপিত হলো। জিহাদের অন্য প্রকারগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিশ্লেষণ প্রজোয্য।

হাদীস বিশ্লেষকদের উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে বুঝে আসে যে, জিহাদের অনেকগুলো প্রকার রয়েছে। আর তা'লিম ও তা'আল্লুম অর্থাৎ দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষাগ্রহণ করাও এক প্রকার জিহাদ, বা জিহাদেরই একটি প্রকার। কাজেই জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার অর্থাৎ স্বশস্ত্র জিহাদের ক্ষেত্রে যদি সম্মানী দেওয়া-নেওয়া জায়েয হয়ে থাকে এবং এই আর্থিক বিনিময় গ্রহণ করাটা যদি সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদানের পরিপন্থী না হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই বিনিময়কে خير المعاش বা সর্বোত্তম জীবিকা অভিহিত করে থাকেন, আমাদের ফকিহগণ যদি এই সবেতন যুদ্ধকে তিজারত বা বাণিজ্য থেকেও উত্তম প্রতিপন্ন করেন এবং এর বিনিময়ে বেতনের লেনদেনকে সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদানের পরিপন্থী না মনে করেন তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকারের ক্ষেত্রে সম্মানী নেওয়া যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা ও খুলাফায়ে রাশেদিনের রাষ্ট্রপরিচালনা থেকে প্রমাণিত, কাজেই জিহাদের অবশিষ্ট প্রকারগুলোতেও সম্মানী-ভাতা গ্রহণ করাও যুক্তির মানদণ্ডেই জায়েয ও বৈধ হবে। এই আর্থিক বিনিময় গ্রহণ করাটা সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদানের পথে প্রতিবন্ধক হবে না। এ কারণেই দেখা যায়, খুলাফায়ে রাশেদিন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমও দ্বীনের প্রয়োজনীয় সবগুলো খিদমতের জন্যে আবশ্যকীয়তা বিবেচনা করে সম্মানী-ভাতা গ্রহণ করাকে বৈধতা দিয়েছেন। আমাদের ফকিহগণও আমিরুল মুমিনিন, কাজি (বিচারক), মুফতি ও দ্বীনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে সম্মানী গ্রহণ করা জায়েয বলে রায় দিয়েছেন। বিষয়টি আমরা সামনে সবিস্তার আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনি খেদমত করে সম্মানী গ্রহণ সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদিন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থা

হযরত আবু বকর রাদি. এর কর্মপন্থা

সাহাবায়ে কেরামের জীবনী ও খুলাফায়ে রাশেদিনের কর্মপন্থার দিকে তাকালে সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, তাঁরা দ্বীনি খিদমতের জন্যে সম্মানী গ্রহণ করাকে যেমন শরিয়তবিরোধী মনে করতেন না, তেমনই মাকরুহ বা অপ্রিয় ও ঘৃণিত কাজও মনে করতেন না। এমনকি তাঁরা বিনিময় নেওয়াকে সাওয়াব ও প্রতিদানপ্রাপ্তির জন্যে অন্তরায়ও মনে করতেন না। তাঁরা বরং এই আর্থিক বিনিময় গ্রহণকে যেকোনো ধরনের সংশয় ও অপ্রিয়তার উর্ধ্বে উঠিয়ে সম্পূর্ণ হালাল ও পবিত্র উপার্জন মনে করতেন। এ কারণেই দেখা যায় যে, হযরত আবু বকর রাদি. ও হযরত উমর রাদি. প্রমুখ আমিরুল মুমিনিনের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন ও অপরাপর দ্বীনি খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার বদলা হিসেবে বাইতুল মাল (রাজকোষ) থেকে নিয়মিত সম্মানী নিয়েছেন।

হযরত আবু বকর রাদি. আমিরুল মুমিনিন হওয়ার পর প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, সাংসারিক ব্যয়ভার নির্বাহ করার জন্যে বিগত জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য চলমান রাখবেন। কিন্তু হযরত উমর রাদি. তাঁকে ব্যবসা থেকে নিষেধ করে অনুরোধ করে বললেন যে, হযরত, আপনি যদি এখনো ব্যবসায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাহলে মুসলমানদের নেতৃত্ব, রাষ্ট্রপরিচালনা ও সাধারণ জনগণের নানা সমস্যার সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো কে সামাল দেবে? উভয় কাজ একসাথে করা সম্ভব নয়। সাংসারিক ব্যয়ভার পূরণের জন্যে আপনি বাইতুল মাল থেকে সম্মানী-ভাতা নিন। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ অনুরোধের প্রেক্ষিতে আবু বকর রাদি. বাইতুল মাল থেকে সম্মানী নিতে সম্মত হন। বুখারি শরিফের বর্ণনায় এসেছে—

أن عائشة قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي و شغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبو بكر من هذل المال و يحترف للمسلمين فيه. (بخارى: ١\١٧٨)

বিষয়টি নিয়ে শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. ও হযরত উমরে ফারুক রাদি. এর মাঝে যেই ঐতিহাসিক আলাপচারিতা হয়েছিল, তা বিশ্ববিখ্যাত ও স্বতোসিদ্ধ। মুহাদ্দিসিনে কেরাম ও আহলে সিয়ার ছাড়াও প্রথম যুগের ফকিহগণ সেই কথোপকথনকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এমনকি আল্লামা আইনি রহ. এ কথা পর্যন্ত নকল করেছেন যে, পরামর্শের পর হযরত আবু বকর রাদি. এর জন্যে যেই সম্মানী নির্ধারিত হয়েছিল, তার পরিমাণ ছিল দু' হাজার বা আড়াই হাজার। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. বলেন, আমার সন্তান-সন্ততি আছে। তাদের জন্যে এ পরিমাণ অর্থ যথেষ্ট হবে না। তখন পরামর্শ করে আরো পাঁচশো যুক্ত করা হয়। বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'উমদাতুল কারি'-এর মাঝে এসেছে—

> 'হযরত মায়মুনা রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদি. যখন খলিফা হন তখন তার জন্যে দু' হাজার দিরহাম নিধারণ করা হয়। তখন তিনি বলেন, আরো বৃদ্ধি করুন। কেননা আমার পরিবার ও সন্তান রয়েছে। যার প্রেক্ষিতে আরো পাঁচশো বাড়ানো হয়।' (বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারী : ১১/১৮৫)

'মাবসুত' গ্রন্থের মঝে হযরত সারাখসি রহ. বলেন—

> 'মাবসুত গ্রন্থের মাঝে সারাখসি রহ. বলেন—'ইমামের জন্য রাজকোষ থেকে সে পরিমাণ সম্মানী দেওয়া ওয়াজিব, যা তার সাংসারিক ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে যথেষ্ট হবে। এ পরিমাণ অর্থ তার জন্যে সম্মানী হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। এর পক্ষে দলিল হলো, আবু বকর রাদি. খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর একদিন উমর রাদি. দেখতে পেলেন, তিনি ঘরের কিছু পণ্য বহণ করে কোথাও যাচ্ছেন। তখন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুলের খলিফা! কোথায় যাচ্ছেন আপনি? তিনি বললেন, আমি বাজারে যাচ্ছি পরিবারের কিছু আসবাব বিক্রয় করতে। যেন বিক্রিলব্ধ অর্থ আমার পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারি। তখন উমর রাদি. সাহাবায়ে কেরামকে একত্র করলেন। সবাই পরামর্শক্রমে তাঁর জন্য সম্মানী নির্ধারণ করলেন, দৈনিক দ' দিরহাম ও দুই তৃতীয়াংশ বা তিন দিরহাম ও এক দিরহামের দু' তৃতীয়াংশ। বেতনের অংকের ব্যাপারে বর্ণনাগুলো একরকম নয়।
>
> এরপর যখন উমর রাদি. খলিফা হন তখনো তিনি বাইতুল মাল থেকে সম্মানী নিয়েছেন। যেমনটা বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেছেন, প্রতিদিন যেসব উট জবেহ করা হবে, সেগুলো থেকে গর্দানের অংশ উমরের পরিবারের জন্য।
>
> এরপর যখন হযরত উসমান রাদি. খলিফা হন তখন তিনি বাইতুল মাল থেকে কোনো সম্মানী বা বিনিময় নিতেন না। কেননা তিনি ধনী ছিলেন।
>
> তবে হযরত আলী রাদি. সম্মানী নিয়েছেন। বর্ণনানুসারে, তিনি বলেছেন, আমার সম্পদ তোমাদের সম্পদ হতে প্রতিদিন দু' পাত্র গোশতমিশ্রিত রুটি। (মাবসুত লিস সারাখসি : ৩/১৯)

শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব তার কিতাব হেকায়াতে সাহাবার মাঝে লিখেছেন—

> হযরত আবু বকর রাদি. কাপড়ের ব্যবসা করতেন। সেই ব্যবসার আয় দিয়েই সংসার নির্বাহ করতেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরের ঘটনা। একদিন তিনি যথারীতি কয়েকটি চাদর হাতে নিয়ে বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে হযরত উমর রাদি. এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় চললেন? বললেন, বাজারে যাচ্ছি। উমর রাদি. তখন জিজ্ঞেস করলেন, যদি এভাবে আপনি ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে পড়েন তাহলে খেলাফতের দায়িত্বভারের কী হবে! আবু বকর রাদি. প্রশ্ন ছুড়লেন, তাহলে আমার পরিবার-পরিজনকে কোত্থেকে এনে খাওয়াব? উমর রাদি. তখন নিবেদন করলেন, আবু ওবায়দা —যাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমিন'-'বিশ্বস্ত' হওয়ার উপাধী দিয়েছিলেন— চলুন, তার কাছে যাই। তিনি আপনার জন্যে বাইতুল মাল থেকে কিছু অর্থ নির্ধারণ করে দেবেন। তারা দু'জন হযরত আবু উবায়দা রাদি. এর কাছে হাজির হলেন। তিনি একজন মুহাজির যেই মাঝারি অংকের সম্মানী পেয়ে থাকে, ঠিক সেই পরিমাণ সম্মানী নির্ধারণ করে দিলেন। সেই অংক থেকে কম-বেশ কোনোটাই করেননি। [হিকায়াতে সাহাবা, তৃতীয় অধ্যায়, ঘটনা : ৪]

হযরত উমর ফারুক রাদি. এর কর্মপন্থা

সাইয়্যেদুনা হযরত উমর ফারুক রাদি.-ও আবু বকর রাদি.-এর কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন। হযরত আবু বকর রাদি.-এর ইনতিকালের পর তিনি যখন খলিফা হন তখন তিনি নিজেও একজন বড় মাপের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর রাদি.কে পূর্বে যেই মাশওয়ারা দিয়েছিলেন যে, খেলাফত ও

তিজারত একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়া খুবই দুরহ ব্যাপার। দুটি ভারী দায়িত্ব একসঙ্গে পালন করা সহজসাধ্য নয়। কাজেই ব্যবসা গুটিয়ে এনে খেলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা দরকার। এ কারণে বাইতুল মাল থেকে সম্মানী গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। পূর্বের সেই পরামর্শের ওপর হযরত উমর রাদি. নিজেও আমল করেন। ব্যবসা বন্ধ করে খেলাফতের কাজে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। তখন থেকে তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্যে বাইতুল মাল (রাজকোষ) থেকে সম্মানী গ্রহণ করতেন।

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. তাঁর বহুল পঠিত গ্রন্থ 'হিকায়াতে সাহাবা'-এর মাঝে নকল করেছেন—

> হযরত উমর রাদি.ও ব্যবসা করতেন। খলিফা মনোনীত হওয়ার পর তার জন্যে বাইতুল মাল থেকে সম্মানী নির্ধারণ করা হয়। তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় সবাইকে একত্র করে বলেন, আমি ব্যবসার মাধ্যমে আমার জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন তোমরা আমাকে খেলাফতের দায়িত্বে নিমগ্ন বানিয়ে ফেলেছো। কাজেই এখন আমার জীবিকা নির্বাহের সুরত কী হবে? উপস্থিত লোকজন নানা পরামর্শ দিতে শুরু করেন। ওদিকে হযরত আলি রাদি. নিশ্চুপ বসেছিলেন। হযরত উমর রাদি. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার অভিমত কী? উত্তরে তিনি বলেন, 'আপনার ও আপনার পরিবারের জন্যে মাঝারি মানের যে অংক যথেষ্ট হয়, আমি তার প্রস্তাব দিচ্ছি। তাঁর এই পরামর্শ হযরত উমর রাদি. এর মনোঃপূত হলো। তিনি গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর জন্যে মধ্যম ঘরানার অংক নির্ধারিত হয়। (হিকায়েতে সাহাবা, তৃতীয় অধ্যায়, কিস্‌সা নয় ৫, পৃ.৪৯)

হযরত উমর ফারুক রাদি. এর দ্বিতীয় ঘটনা

মুসলিম শরিফের কিতাবুয যাকাতে ইবনুস সায়েদি আল মালেকির একটি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত উমর রাদি. আমাকে যাকাত উসুলের জন্যে গভর্নর বানিয়ে প্রেরণ করেন। আমি যখন দায়িত্ব পালন শেষে উসুলকৃত অর্থ তাঁর কাছে পৌঁছে দিই তখন তিনি আমার দিকে আমার কাজের বিনিময় বাড়িয়ে দেন। আমি তখন নিবেদন করি যে, আমি এ খেদমত আল্লাহ তাআলার জন্যে করেছি। আমার উজরতের প্রয়োজন নেই। আমার বিনিময় তো আল্লাহর কাছে।

উত্তরে হযরত উমর রাদি. বলেন, আমি তোমাকে যা দিচ্ছি তা তুমি সানন্দ্যে গ্রহণ কোরো। আমার সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর নির্দেশে আমি এ দায়িত্ব পালন করেছিলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকেও আমার কাজের বিনিময় প্রদান করেন। আমি যখন তোমার মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলি যে, আমার বিনিময় আল্লাহর কাছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা নাকচ করে তাগাদার সঙ্গে আমার হাতে বিনিময় তুলে দেন। বর্ণনাটি দেখুন—

> ইবনুস সায়েদি আল মালিকি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—উমর রাদি. যাকাত উত্তোলনের কাজে আমাকে নিয়োগ দেন। যখন আমি কাজ সম্পন্ন করে যাকাতের অর্থ তাঁকে বুঝিয়ে দিই তখন তিনি আমাকে এর বিনিময় গ্রহণ করার জন্য আদেশ করলেন। আমি বললাম, আমি তো কাজগুলো করেছি আল্লাহর জন্য। এর বদলা আমি আল্লাহর থেকেই নেব। তখন তিনি বলেন, 'আমি আপনাকে যা দিচ্ছি, নিঃশঙ্কোচে গ্রহণ করুন। কেননা আমিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যাকাত উত্তোলনের কাজ করেছিলাম। তখন তিনিও আমাকে বিনিময় প্রদান করেন। সেসময় আমিও আপনার মতো বিনিময় গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম। তখন আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যখন তোমার না চাওয়া সত্ত্বেও

কোনো কিছু তোমাকে দেব তখন তা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করবে। সেই বস্তু খেতেও পারবে, অন্যকে দানও করতে পারবে। (সহিহ মুসলিম, যাকাতের অধ্যায়, হাদিস নং : ২৪০৫)

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি রহ. বলেন, হযরত উমর রাদি. ইবনুস সায়েদি মালেকি রহ.কে যেই বিনিময় দিয়েছিলেন, তা ছিল তাঁর কাজের পারিশ্রমিক। এ হাদিস থেকে বুঝে আসে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমানদের কোনো জাতীয় কাজে নিয়োজিত হয় —সেই জাতীয় কাজটি খালেস দ্বীনি কাজ হতে পারে, আবার দুনিয়াবি কাজও হতে পারে— তাহলে সেই কাজের জন্যে বিনিময় বা পারিশ্রমিক নেওয়া তার জন্যে অবশ্যই জায়েয। মুসলমানদের জাতীয় কাজের কিছু উদাহরণ হলো, ফতোয়া দেওয়া, বিচারকার্য সম্পন্ন করা, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের ইহতিসাব বিভাগে কর্মরত হওয়া। আল্লামা নববি রহ. এর ভাষ্যে বিষয়টি পড়ুন—

‘ইবনুস সায়েদি মালেকি রহ. বলেন, আমি হযরত উমর রাদি.এর যুগে যাকাতা উসুলের দায়িত্ব পালন করেছি। তখন তিনি আমাকে সম্মানী দিয়েছিলেন।’ এ হাদিস থেকে বুঝে আসে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমানদের কোনো জাতীয় কাজে নিয়োজিত হয় —সেই জাতীয় কাজটি খালেস দ্বীনি কাজ হতে পারে, আবার দুনিয়াবি কাজও হতে পারে— তাহলে সেই কাজের জন্যে বিনিময় বা পারিশ্রমিক নেওয়া তার জন্যে অবশ্যই জায়েয। মুসলমানদের জাতীয় কাজের কিছু উদাহরণ হলো, ফতোয়া দেওয়া, বিচারকার্য সম্পন্ন করা, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের ইহতিসাব বিভাগে কর্মরত হওয়া। [শরহে মুসলিম লিন নববি : ১/৩৩৫]

যাকাত উসুলকারীদেরকে যেই অর্থ দেওয়া হয়, ফুকাহায়ে কেরাম সেটাকেও ‘উজরত’ শব্দে ব্যক্ত করেছেন। যেমন রদ্দুল মুহতারের মাঝে এসেছে—

‘কেননা সে এখান থেকে যেই সম্মানীর হকদার হচ্ছে, তা এক দৃষ্টিকোণ থেকে তার পরিশ্রমের সম্মানী। মি‘রাজ গ্রন্থে এসেছে, ‘উমালা শব্দের অর্থ পারিশ্রমিক।’ [রদ্দুল মুহতার : ২/৬৫]

হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাদি. এর আমল

হযরত উমর ফারুক রাদি. এর উল্লেখিত হাদিসের সূত্র ধরে আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানি রহ. আল্লামা তাবারি রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথা নকল করেছেন যে,

“উক্ত হাদিসে খুবই স্পষ্টভাবে, পরিষ্কার শব্দে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমানদের সেবায় নিয়োজিত থাকে তাহলে সে তার এই সেবা কার্যক্রমের বিনিময় নিতে পারবে। যেমন মুসলমানদের গভর্নর, মুফতি, কাযি, মালে গনিমত ও সদকা উসুলের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। এমন আরো বেশ কিছু জাতীয় খেদমত রয়েছে। কেননা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাদি.–কে তাঁর কাজের বিনিময় দিয়েছিলেন। আর ইবনুল মুনযির লিখেছেন, হযরত যায়দ ইবনে সাবেত রাদি. বিচারকের দায়িত্ব পালন করার জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। (ফতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম, কিতাবুয যাকাত : ৩/৬৮)

সম্মানী নিয়ে দ্বীনি খেদমত করা সাওয়াবের পরিপন্থী নয়

খুলাফায়ে রাশেদিন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের উপর্যুক্ত কর্মপন্থা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, তাঁরা দ্বীনের খেদমত করে তার জন্যে সম্মানী গ্রহণ করতেন। তাঁরা বিনিময় নিয়ে দ্বীনের খেদমত করাকে তাওয়াক্কুল ও তাকওয়ার পরিপন্থী মনে করতেন না। তাঁরা এ বিনিময় গ্রহণকে সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদানের পথে প্রতিবন্ধক মনে করতেন না। এমন নয় যে, শুধু খুলাফায়ে রাশেদিনই এমন কর্মপন্থা

অবলম্বন করেছেন; বরং অন্যান্য সাহাবিও একই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন। যেমনটি আমরা উপরে আলোচনা করেছি। কাজেই যারা এ কথা বলে বেড়াচ্ছে যে, 'সাওয়াব ও সম্মানী একত্র হতে পারে না। পড়ানোর বিনিময়ে অর্থ নিলে সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কার পাবে না' তারা অনেক বড় বিভ্রান্তির শিকার। আপনিই বলুন, তাদের পক্ষে কি এ কথা বলা সম্ভব যে, যেহেতু খুলাফায়ে রাশিদিন সম্মানী নিতেন, কাজেই তারা আমিরুল মুমিনিনের দায়িত্ব পালন করার সাওয়াব আল্লাহর কাছে পাবেন না?

মুসলিম শরিফে হযরত আবু হুরাইরা রাদি.-এর একটি রিওয়ায়েত আছে। যেখানে তিনি বলেন,

> 'সাতজন ব্যক্তি কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে। সেদিন তাদেরকে খুব সম্মান ও ইজ্জত দেওয়া হবে। ওই সাতজনের একজন হলেন, ইমামে আদেল অর্থাৎ আমিরুল মুমিনিন।' (মুসলিম শরিফ, কিতাবুয যাকাত; ফতহুল মুলহিম : ৩/৫৭)

তিরমিজি শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে—

عن ابى سعيدؓ مرفوعا أحب الناس الى الله يوم القيامة و أقربهم منه مجلسا امام عادل.

> কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নিকটবর্তী ও সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হবেন, ন্যায়পরায়ণ ইমাম। (ফাতহুল মুলহিম : ৩/৫৭)

এখন আপনি ভেবে দেখুন, দ্বীনের খেদমতের ওপর বিনিময় গ্রহণ করা যদি সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদানের পরিপন্থী হয় এবং দ্বীনের খেদমতের ওপর সম্মানী নিলে সাওয়াব ও প্রতিদান চলে যায় তাহলে আপনার কথার অর্থ দাঁড়ায়, 'হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. ও হযরত উমর ফারুক রাদি. যেহেতু আমিরুল মুমিনিন মনোনীত হওয়ার পর নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্যে সম্মানী গ্রহণ করেছেন, কাজেই তাঁরাও সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবেন এবং উপর্যুক্ত হাদিসে ইমামে আদেল বা ন্যায়পরায়ণ শাসকের যেই ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ আরশের ছায়াতলে অবস্থান লাভ ও আল্লাহ তাআলার সবিশেষ নৈকট্য ও একান্ত ভালোবাসার অবস্থান লাভ, এই সাওয়াব ও প্রতিদান থেকেও হযরত আবু বকর রাদি. ও হযরত উমরে ফারুক রাদি. বঞ্চিত হবেন! কেননা তাঁরা দু'জন খেলাফতের দায়িত্বভার পালনের জন্যে বিনিময় স্বরূপ সম্মানী গ্রহণ করেছিলেন।' বলুন, উম্মতের কোনো ব্যক্তি কি এ কথার প্রবক্তা হতে পারে? আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তো এ বিশ্বাস লালন করি যে, পুরো উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন সাইয়্যেদুনা আবু বকর সিদ্দিক রাদি. ও সাইয়্যেদুনা উমরে ফারুক রাদি.। তাঁরাই ইমামে আদেল বা ন্যায়পরায়ণ শাসকের সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ। মুসলিম শাসকদের মধ্য হতে তাঁরা দু'জনই আল্লাহর আরশের সবচেয়ে কাছের আসন পাবেন। পুরো উম্মতের মাঝে তাঁরা দু'জনই আল্লাহর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার হকদার। যদিও তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্যে সম্মানী নিয়েছিলেন; কিন্তু এ নিয়ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কোনো সদস্যই তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে আঙুল তুলতে পারে না।

সাওয়াব নির্ভর করে ইখলাসের ওপর, বেতনের ওপর নয়

হযরত আশরাফ আলী থানবি রহ. বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, 'দ্বীনের খেদমত করে সম্মানী নেওয়াটা কখনই সওয়াব ও পরকালীন প্রতিদানের প্রতিবন্ধক নয়। কেননা সওয়াব পাওয়া-না পাওয়া নির্ভর করে ইখলাসের ওপর। আর ইখলাসের স্থান অন্তরে; টাকা বা বিনিময়ে নয়। হতে পারে একজন লোক সম্মানী নিয়ে পড়াচ্ছেন; কিন্তু তার অন্তরে ইখলাস রয়েছে। অর্থাৎ সম্মানী নিয়েও তিনি একজন মুখলিস। আবার এটাও সম্ভব যে, আরেকজন লোক কোনো সম্মানী ছাড়াই পড়াচ্ছেন; কিন্তু তার অন্তরে ইখলাস নেই। স্রেফ প্রসিদ্ধি ও পার্থিব সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে পড়াচ্ছে। অথবা অন্য কোনো অসৎ

উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে মাদরাসায় সম্মানী না নিয়ে পড়াচ্ছে। কাজেই মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত হলো, সম্মানী নিয়ে পড়ানো কখনই ইখলাস, সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদানের পরিপন্থী নয়।' والله اعلم

শরয়ি দলিল

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. উপরের এ অভিমত হাদিস ও ইসলামি শরিয়তের আলোকেই দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি যে বলেছেন, 'দ্বীনের খেদমত করে সম্মানী নেওয়াটা কখনই সওয়াব ও পরকালীন প্রতিদানের প্রতিবন্ধক নয়। কেননা সওয়াব পাওয়া-না পাওয়া নির্ভর করে ইখলাসের ওপর। অর্থাৎ কাজটি পুরোপুরি আল্লাহকে খুশি করার জন্যে হতে হবে। সুনাম কুড়ানো, প্রসিদ্ধি লাভ করা এসব যেন উদ্দেশ্য না হয়।' তাঁর এ কথাগুলো হাদিস ও উসুলে শরিয়তের শতভাগ সমর্থক। আমরা দেখতে পাই মুসলিম শরিফের এক হাদিসে এসেছে—

> 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কারী ও আলেম ব্যক্তিকে ডেকে বলবেন, 'আমি তোমাদেরকে ইলমের নিয়ামত দান করেছিলাম। তোমরা তা দ্বারা কী করেছো?' তারা বলবে, আমরা পড়েছি, পড়িয়েছি এবং লোকদেরকে শিখিয়েছি।
>
> আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কাজগুলো এজন্য করেছো যেন তোমাদের নাম প্রসিদ্ধ হয়। তোমাদেরকে যেন সবাই বড় আলেম বলে, বড় কারী বলে। তোমাদের সেই স্বার্থ উদ্ধার হয়েছে। অর্থাৎ লোকেরা পৃথিবীতে তোমাদেরকে বড় আলেম উপাধী দিয়েছে। অর্থাৎ তারা পড়া ও পড়ানোর ক্ষেত্রে মুখলিস ছিল না। এজন্যে আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ করবেন, তাদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ কোরো।'

এ হাদিস থেকে বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হওয়া-না হওয়া এবং সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদান পাওয়া-না পাওয়া ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে। এটা কখনই সম্মানী নেওয়া-না নেওয়ার ওপর নির্ভর করে না। যদি সম্মানী নেওয়া-না নেওয়ার উপরেই কবুল হওয়া-না হওয়া নির্ভর করতো, যদি এটাই সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কারের মানদণ্ড হতো তাহলে আল্লাহ তাআলা এ কথা বলতেন যে, হে বান্দা, তুমি তো সম্মানীর বিনিময়ে পড়িয়েছো; সেই সম্মানী যেহেতু পেয়ে গেছো, কাজেই এখন কিছুই পাবে না। অথচ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা বলেননি। বরং তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, কবুল হওয়া-না হওয়া নির্ভর করে ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের ওপর। কেউ যদি লৌকিকতা ও প্রসিদ্ধির নিয়তে দ্বীনের খেদমত করে তাহলে সে বঞ্চিত হবে। অন্যথায় নয়। এর সঙ্গে সম্মানী নেওয়া-না নেওয়ার কোনো সম্পর্কই নেই।

মোটকথা, এ হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হচ্ছে যে, সম্মানী নেওয়া-না নেওয়া সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে না। এ কারণেই দেখা যায়, আমাদের ফকিহগণ মূলনীতি শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবে এ কথা পরিষ্কার শব্দে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'সকল নেক কাজ ও দ্বীনি খেদমতের সাওয়াব নির্ভর করে নিয়তের সততা ও ইখলাসের ওপর।' দেখুন, আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. তাঁর الأشباه والنظائر (আল-আশবাহ ওয়ান নাজাইর) গ্রন্থে কী লিখেছেন—

> প্রথম শাস্ত্র : প্রথম মূলনীতি : নিয়তের সততা ব্যতিরেকে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। প্রতিটি নেক কাজে সাওয়াব পেতে হলে অবশ্যই নিয়ত পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে। নিয়ত বলতে উদ্দেশ্য হলো, যখন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হবে, আমি পড়িয়ে, ফতোয়া দিয়ে, বা লেখালেখি করার মাধ্যমে দ্বীন প্রচার করব স্রেফ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে, তখনই সেই ব্যক্তি সাওয়াব লাভ

করবে।

হামাভি রহ. বলেন, 'ইবাদত বলা হয়, যা পালন করলে সাওয়াব পাওয়া যায় এবং যা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল (আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, পৃষ্ঠা : ৮৫)

আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরি রহ. এর এই সুস্পষ্ট লেখা থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, পাঠদান, ফতোয়া প্রদান, লেখালেখি বা এ জাতীয় অন্যান্য দ্বীনি খেদমতের ক্ষেত্রে সাওয়াব লাভ করাটা সম্পূর্ণরূপে নিয়ত ও ইখলাসের ওপর নির্ভর করে। সম্মানী গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই আজকাল তাবলীগের বেশ কিছু সাথী যে কথাটি বলে বেড়াচ্ছে যে, 'হয় বিনিময় নাও, নয় প্রতিদান নাও। প্রতিদান তো একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দেবেন। পরকালীন প্রতিদান ও দুনিয়াবি সম্মানী এক জায়গায় একত্র হতে পারে না।' এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ও ইসলামি শরিয়তের মৌলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এটি উলামায়ে কেরামের ওপর তাদের অবান্তর কুধারণা ও বাস্তবতা বিবর্জিত অপভাবনা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তাআলা এই মহামারী থেকে উম্মতকে রক্ষা করুন। আমিন।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদি. যে দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে সম্মানী দিতেন ও নিতেন এবং এটাই যে তাঁদের প্রাত্যহিক অভ্যাস ছিল, তার কিছু সুস্পষ্ট উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—

হযরত উমর রাদি. গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত দ্বীনি খেদমতের ওপর সম্মানী দিতেন

হযরত উমর রাদি. এর জীবনী ও তাঁর পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন, তাঁর সময়ে যে কয়জন সাহাবি দ্বীনের খেদমত করে বিনিময় বা সম্মানী নিতে পসন্দ করতেন না; বা এটাকে তাকওয়ার পরিপন্থী মনে করতেন, তিনি তাঁদের সবার ভুল বুঝাবুঝি দূর করে দিতেন। তিনি জোর তাগাদা দিয়ে তাঁদেরকে দিয়ে সম্মানী-ভাতা নেওয়াতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা শিবলি রহ. হযরত উমর রাদি. সম্পর্কে খুবই চমৎকার কিছু কথা লিখেছেন। আপনারা তা পড়ে দেখুন—

> একটা সময় এমন ছিল যে, মানুষ কোনো খেদমতের বিনিময় নিতে পসন্দ করতেন না। এটাকে তারা খোদাভীরুতা ও পবিত্রতার পরিপন্থী মনে করতেন। তাঁদের সেই মানসিকতা হুবহু এ রকম, যেমন বর্তমান সময়ের নেককার বক্তাদেরকে আপনি যদি এ প্রস্তাব দেন যে, তারা নিয়মিত নিজেদের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাবেন আর মাস শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেবেন, তাহলে এটি তাদের কাছে ভীষণ অপ্রিয় মনে হবে। অথচ তারা তাদের হাদিয়া ও উপহার নামে যেই অর্থগুলো পান, সেগুলো গ্রহণ করতে তারা কিন্তু কুণ্ঠিত হন না।
>
> হযরত উমর রাদি. এর যুগেও অনেক লোক সেই ভুল–ভ্রান্তির শিকার ছিলেন। অথচ বাস্তবতা হলো, তাদের সেই মনোভাব মানবিক সভ্যতা ও নিয়ম–শৃঙ্খলার বিধি–বিধানের পরিপন্থী ছিল। এ জন্যে হযরত উমর রাদি. সবিশেষ চেষ্টার মাধ্যমে সেই বিভ্রান্তি দূর করেন। সম্মানী–ভাতা নির্ধারণ করেন। তাইতো দেখা যায়, একবার হযরত আবু উবায়দা রাদি. এর মতো বিখ্যাত সাহাবি ও সেনাপতি যথোচিত সম্মানী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তখন হযরত উমর রাদি. বেশ কষ্ট করে তাকে বোঝাতে সমর্থ হন। [আল ফারুক বিহাওয়ালা তবারি : ২৫৭৭]

উমর ও উসমান রাদি. শিক্ষক, ফকিহ, ইমাম ও মুআযযিনদের জন্যে সম্মানী নির্ধারণ করেছিলেন

আল্লামা শিবলি রহ. তাঁর বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'আল-ফারুক' এর মাঝে সাইয়্যেদুনা উমরে ফারুক রাদি. এর এ জাতীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপগুলোর ওপর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> **'হযরত উমর রাদি. সবগুলো বিজিত অঞ্চলের সর্বত্র কুরআন কারিমের পাঠদান শুরু করেন। শিক্ষক ও ক্বারি নিয়োগ দিয়ে তাদের জন্যে সম্মানী নির্ধারণ করেছেন। কাজেই ইতিহাসের পাতায় এটিও হযরত উমর রাদি. কর্তৃক গৃহীত প্রথম উদ্যোগের খাতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে, তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষকদের জন্যে সম্মানী নির্ধারণ করেছেন। বেতনের পরিমাণ ওই যুগের পরিস্থিতি বিবেচনা করে কম ছিল না। যেমন, বিশেষত মদিনা মুনাওয়ারায় ছোট ছোট শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যেসব মক্তব ছিল, তাদের মাসিক সম্মানী ছিল পনেরো দিরহাম।**
>
> **হযরত উমর রাদি. গভর্নরদের উদ্দেশে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, যেসব লোক কুরআন শেখবে, তাদের জন্যে সম্মানী নির্ধারণ করে দেওয়া হোক।** (কানযুল উম্মাল : ১/২২৪)

আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. 'সিরাতুল উমরায়ন' গ্রন্থে লিখেছেন—

ان عمر بن الخطاب ﷺ وعثمان بن عفان ﷺ كان يرزقان المؤذنين و الأئمة

> **হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ও হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদি. মুয়াযযিন ও ইমামদেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সম্মানী দিতেন।** (সিরাতুল উমরাইন লিবনিল জাউযি)

মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মাঝে আছে যে,

> **'মসজিদে নববিতে নামাযের কাতার ঠিক করে দেওয়ার জন্যেও বিশেষ জনবল দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।'** (মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ : ২৮৬)

হযরত উমরে ফারুক রাদি. সবগুলো বিজিত অঞ্চলের জন্যে ফকিহ ও শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, তাঁরা জনগণকে ধর্মীয় বিধি-বিধান শেখাবেন।... ইবনুল জাওযি রহ. এর পরিষ্কার লেখা থেকে বুঝে আসে যে, হযরত উমর রাদি. সেই ফকিহদের জন্যে সম্মানী নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আর বাস্তবতা হলো, পাঠদানের এই সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত ধারাবাহিকতা সম্মানী ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভব নয়।' (আল ফারুক, পৃষ্ঠা : ২৪৭-২৫৪, লাহোর সংস্করণ)

এতক্ষণ সংক্ষেপে আপনাদের সামনে পাঠদান, অধ্যাপনা ও দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার জন্যে বিনিময় গ্রহণের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদিন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষত হযরত উমরে ফারুক রাদি. এর কর্মপন্থা তুলে ধরা হলো। ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিগুলো সামনে রেখে নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, কুরআনের পাঠদান, দ্বীন শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, ফতোয়া দেওয়া, বিচার করা, ইমামতি ও আযানের দায়িত্ব পালন করার জন্যে বিনিময় গ্রহণ করাকে সকল খুলাফায়ে রাশিদিন ও অপরাপর সাহাবায়ে কেরাম রাদি. নিঃসংকোচে, নির্দ্বিধায় জায়েয মনে করতেন। এখানে কোনো ধরনের কারাহাত বা অপ্রিয়তার লেশমাত্র নেই। শুধু জায়েযই নয়; তাঁরা বরং একে উত্তম মনে করতেন। কেউ নিতে না চাইলে তাকে জোর তাগাদা দিয়ে নিতে বলতেন। তারা এ জাতীয় খেদমতের জন্যে সম্মানী নেওয়াকে কখনই তাকওয়ার পরিপন্থী মনে করতেন না। তারা সম্মানী নেওয়ার কারণে সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা কখনই বলেননি। উদাহরণস্বরূপ ইবনে মাজাহ থেকে হযরত আবু যর রাদি. এর একটি বর্ণনা তুলে ধরছি। যেখানে তিনি বলেছেন—

> হযরত আবু যর রাদি. বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু যর, প্রত্যুষে জেগে তুমি কুরআন কারিমের একটি আয়াত শিখবে। এই শেখা তোমার জন্যে একশো রাকাত নামায পড়া থেকে উত্তম। আর দ্বীন ও শরিয়তের কোনো মাসআলা শেখা হাজার

রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম। সেই মাসআলার ওপর তুমি আমল করো, বা না করো, ফজিলতে কোনো ধরনের তারতম্য নেই। (ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা : ২০। নাওয়াদিরুল হাদিস, পৃষ্ঠা : ৩৫০)

এ হাদিস থেকে বুঝে আসে যে, দ্বীনি ইলম শেখা ও শেখানোর এই ফযিলত সবেতনে পড়ালেও অর্জিত হবে। কেননা সাহাবায়ে কেরাম রাদি. উজরত ও আজর অর্থাৎ সম্মানী ও সাওয়াবকে পরস্পরে বিপরীত মনে করতেন না। নয়তো তারা কখনই এতো বড় সাওয়াব ও প্রতিদান নষ্ট হতে দিতেন না। তারা অবশ্যই সাওয়াবের লোভে বিনা বেতনেই পড়াতেন। কিন্তু তারা যেহেতু সম্মানী নিয়ে পড়ানোকে সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদানের পরিপন্থী মনে করতেন না, এজন্যে কোনো ধরনের দ্বিধা-সংকোচের পরোয়া না করেই তারা নিজেও সম্মানী গ্রহণ করতেন এবং অন্যকেও এ বাবদ সম্মানী দিতেন। আলোচিত মাসআলায় এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর সামগ্রিক কর্মপন্থা। সে কারণেই পরবর্তী সময়ের সম্মানিত ফকিহগণও সম্মানী গ্রহণ করাকে কারাহাতমুক্ত জায়েয ঘোষণা দিয়েছেন। আমাদের দেওবন্দ ও সাহারানপুরের সকল আকাবির রহ.-এরও কর্মপন্থা ছিল, তাঁরা সবসময় সবেতনেই দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ ফকিহের স্পষ্ট বক্তব্য

খুলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর আদর্শ সামনে রেখে আমাদের ফুকাহায়ে কেরামও এ সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন শিক্ষা দেওয়া, দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া, বিচারকের দায়িত্ব পালন করা, মুফতির দায়িত্ব পালন করা ও এ জাতীয় অন্যান্য দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে শিক্ষক ও আসাতিযায়ে কেরাম সম্মানী নিতে পারবেন। এটি সম্পূর্ণ জায়েয ও যথার্থ। শুধু এতটুকুনই নয়; তাঁরা এ কথাও লিখেছেন যে, আর্থিক প্রয়োজন না থাকলেও সম্মানী নিয়ে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দেওয়া উচিত। অর্থাৎ ধনী ও আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ আলেমের জন্যেও সম্মানী নিয়ে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া জায়েয। কারণ হলো, তাঁরা সাধারণ মুসলমানদের দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত। কাজেই তাঁদের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা সাধারণ মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। সেই অর্থ বাইতুল মাল (রাজকোষ) থেকে উসুল করা হবে। কাজেই তাঁদের জন্যে রাজকোষ থেকে সম্মানী নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এ কারণেই দেখা যায়, যত দিন পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে বাইতুল মালের শরঈ ব্যবস্থাপনা প্রচলিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত শাসকদের পক্ষ থেকে দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক ও কর্মচারীদেরকে সম্মানী-ভাতা দেওয়া হতো।

এই সম্মানী কেন সেই শিক্ষকদের অধিকার, তার কারণও ফুকাহায়ে কেরাম তাঁদের কিতাবে লিখেছেন। তা হলো, তাঁরা দ্বীনের তা'লিম ও কুরআনের পাঠদান ইত্যকার কাজের জন্যে নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গেলে জীবিকা উপার্জনের অন্য মাধ্যমগুলো অর্থাৎ ব্যবসা ইত্যাদি চালিয়ে যাওয়া কঠিন, এ কারণে তারা বাইতুল মালের কাছে সম্মানী-ভাতার হকদার হবেন।

১. শামসুল আইম্মাহ সারাখসি রহ. বাইতুল মালের ব্যয়ের খাতসমূহের তালিকার ওপর আলোচনার একপর্যায়ে লিখেন—

'এ প্রকারে অন্তর্ভুক্ত লোকজন মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বশীল কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। যেমন ধরুন, যারা জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করছেন। তাদের প্রয়োজনীয় জীবিকা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় জীবিকা দিতে হবে। কেননা তারা নিজেদেরকে জিহাদ ও মুসলিমদের ওপর থেকে বিধর্মীদের অনিষ্টতা দূরভিত করার কাজে নিয়োজিত করেছেন। কাজেই তাদেরকে মুসলমানদের গণসম্পত্তি বাইতুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় ভরণ–পোষণ দিতে হবে। তদ্রুপ যারা

মুসলিম সমাজে বিচার, ফতোয়া ও শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে মুসলমানদের কোনো জাতীয় সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন, তাদেরকেও প্রয়োজনীয় সাংসারিক খরচ বাইতুল মাল থেকে প্রদান করতে হবে। (সারাখসি প্রণীত 'আল মাবুসত' ৩/২৮)

২. 'হিদায়া' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম তাঁর লেখা *ফাতহুল কাদির* গ্রন্থে উল্লেখ করেন—

'মুসলিম সমাজের বিচারপতি, যাকাত উসুলকারী ও উলামায়ে কেরামকে বাইতুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় সম্মানী প্রদান করতে হবে। কেননা এ ব্যবস্থাপনা না থাকলে তারা তাদের নিজস্ব জীবিকা উপার্জনের কাজে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হবেন এবং বাতিলের মোকাবেলা করতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন। বাইতুল মাল থেকে বেতনের হকদার লোকদের তালিকা আরেকটু বৃদ্ধি করে লেখক বলেন– মাদরাসার ছাত্র–শিক্ষকরাও বাইতুল মাল থেকে সম্মানী পাবে।' (ফাতহুল কাদির : ৫/৩০৭)

৩. আল্লামা ইবনু নুজাইম *আল বাহরুর রায়েক* গ্রন্থে লেখেন—

(البحرالرائق : ١١٨\٥)

'আল মুহিত গ্রন্থে রয়েছে যে, এই খাতের মাঝে রয়েছে গভর্নর ও তার সহযোগীদের সম্মানী দেওয়া এবং কাযি, মুফতি ও সৎ কাজের আদেশ বিভাগে কর্মরতদেরকে সম্মানী দেওয়া। একই ধারাবাহিকতায় এমন লোকদেরকে সম্মানী দেওয়া, যারা মুসলমানদের জাতীয় সেবায় ও মুসলিম জাতির কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

ইমাম আলি রাজি রহ. থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বাইতুল মাল থেকে কি ধনীরা অংশ পাবে? উত্তরে তিনি বললেন 'না; তবে ধনী ব্যক্তি যদি যাকাত উসুলকারী বা বিচারক হন তাহলে বাইতুল মাল হতে সম্মানী পাবেন। আর ফকিহ ব্যক্তি তখনই বাইতুল মাল থেকে সম্মানী পাবেন, যখন তিনি নিজেকে জনতার মাঝে ফেকাহ শিক্ষাদার ও কুরআন কারিমের পাঠদান কাজে নিয়োজিত রাখবেন।।

কিতাবে আছে, হযরত আবু বকর রাদি. বায়তুল মালের অর্থ জনগণের মাঝে বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতেন। আর হযরত উমর রাদি. বাইতুল মালের অর্থ জনগণের মাঝে বণ্টন করতেন ব্যক্তির প্রয়োজন, দ্বীনি বোধ ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণ অনুপাতে। বর্তমান সময়ে উমর রাদি. কর্তৃক প্রবর্তিত পদ্ধতিই সবচেয়ে উত্তম। অবশ্যই এক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।' (আল বাহরুর রায়েক : ৫/১১৮)

৪. *মাজমাউল আনহুর* গ্রন্থের টীকাস্থিত *বদরুল মুত্তাকা* গ্রন্থে রয়েছে—

'রাজস্ব ও যিম্মিকর ব্যয় হবে মুসলমানদের উন্নয়নমূলক কাজে। যেমন বিদ্রোহী দমন, প্রাচীর নির্মাণ, রাজভবন নির্মাণ, সেতু নির্মাণ ও উলামায়ে কেরাম, মাদ্রাসার শিক্ষক, মুফতিগণের বেতনের খাতে। একই ধারাবাহিকতায় মুফাসসিরিন, মুহাদ্দিসিন, মুফতি, বিচারক ও যাকাত উত্তোলনকারী কর্মকর্তাদের সম্মানীও বাইতুল মাল থেকে প্রদত্ত হবে। (বদরুল মুত্তাকা : ১/৬৭৮)

শিক্ষকদের জন্যে ব্যবসা করা কেন অনুচিত?
শিক্ষকদের জীবিকার দায়িত্ব কাদের ওপর?
এ ব্যাপারে হযরত থানবি রহ. এর কয়েকটি স্পষ্ট বয়ান

দ্বীনের খেদতমত আঞ্জাম দিয়ে সম্মানী গ্রহণের বৈধতা প্রসঙ্গে খুলাফায়ে রাশেদিন ও অন্যান্য সাহাবায়ে

কেরাম রাদি. এর যেই কর্মপন্থা ছিল এবং ফুকাহায়ে কেরাম এ প্রসঙ্গে যে কথাগুলো লিখেছেন, অবিকল তারই প্রতিধ্বনি ফুটে ওঠেছে হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলি থানভি রহ. এর লেখায়। আমরা হযরতের কিতাবাদি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—

(۱) "قرآن شریف مسلمانوں کی مشترک جائیداد ہے، اس لئے اس کی حفاظت بھی سب کو کرنا چاہئے، کچھ افراد ایسے بھی ہونا چاہئے کہ وہ محض خادم قوم ہوں، کیونکہ اگر سب کے سب تحصیلِ معاش ہی میں پڑ جائیں تو دین کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا، دین کے کام میں اگر کوئی بھی نہیں چلے تو یہ کام بند ہو جائے، لہٰذا ضروری ہے کہ ایک جماعت محض خادمانِ دین کی ہو کہ یہ لوگ اس کے سوا اور کوئی کام نہ کریں۔

تو یہ لوگ (یعنی اہلِ علم واہلِ مدارس) عوام اہلِ اسلام کی ضرورتوں میں محبوس ہیں، اور قاعدہ فقہیہ ہے کہ جو شخص کسی کی ضرورتوں میں محبوس ہو اس کا نان ونفقہ اسی شخص کے ذمہ ہوتا ہے، چنانچہ اسی بناء پر زوجہ کا نفقہ شوہر پر، اور قاضی کا نفقہ بیت المال میں، اور شاہد کا نفقہ من لہ الشھادۃ پر ہوتا ہے، پس علماء مسلمانوں کے مذہبی کام میں محبوس ہیں، اور ان کے مذہب کی حفاظت کرتے ہیں، روز مرہ کی جزئیات میں ان کو مذہبی حکم بتاتے ہیں، اور یہ شغل ایسا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا کام نہیں ہو سکتا، چنانچہ مشاہدہ ہے کہ دوسرے کام میں جو لوگ لگے ہیں ان سے یہ کام نہیں ہوتا تو ان کا نان ونفقہ بھی عام مسلمانوں کے ذمہ واجب ہوگا۔

(دعواتِ عبدیت ص: ۱۴۲، ج: ۵، وص: ۱۷۹، ج: ۶)

১. ‘কুরআন কারিম মুসলমানদের গণসম্পত্তি। কাজেই এ কুরআন হিফাজতের দায়িত্ব সবার। সমাজের কিছু লোক এমন হতে হবে, যারা স্রেফ জাতির সেবক হবেন। কেননা জাতির সব সদস্যই যদি জীবিকা উপার্জনে নেমে পড়ে তাহলে দ্বীনচর্চার ধারাবাহিকতা সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। যদি জাতির মাঝে এমন কিছু লোক না থাকে, যারা দ্বীনের কাজ এগিয়ে নেবে তাহলে এই মেহনত বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই আবশ্যক হলো, এমন একটি দল দ্বীনের খিদমতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে, যারা এ কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ করবে না।

কাজেই এ সব লোক (উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসা সংশ্লিষ্ট মহল) মুসলিম জনসাধারণের অতীব জরুরি নানা প্রয়োজন পূরণের কাজে আটকে পড়েছেন। আর ইসলামি ফেকাহর অন্যতম মূলনীতি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি কারো প্রয়োজন পূরণের কাজে আটকে পড়ে তাহলে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ওই ব্যক্তির কাঁধে বর্তাবে। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। কাযির সম্মানী-ভাতা প্রদানের দায়িত্ব বাইতুল মালের ওপর। স্বাক্ষীর ব্যয়ভার প্রদানের দায়িত্ব ওই ব্যক্তির, যার জন্যে এই স্বাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা। একই ধারাবাহিকতায় উলামায়ে কেরাম যেহেতু মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে আটকে আছেন, তাদের মাযহাবের হিফাজতের দায়িত্ব পালন করছেন, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ছোট-খাট মাসআলাগুলোর বিধান জানিয়ে দিচ্ছেন; আর এই ব্যস্ততা এতোটাই প্রকট যে, এর পাশাপাশি অন্য কোনো কাজ বা পেশা পালন করা সম্ভব নয়, আমরা অভিজ্ঞতার আলোকে দেখতে পেয়েছি যে, যারা অন্য কাজে মনোনিবেশ করে তাদের পক্ষে এই দ্বীনি দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা সম্ভব হয় না; কাজেই সেই উলামা ও আহলে মাদারিসের ভরণ-পোষণ প্রদান করা সাধারণ মুসলমানদের যিম্মায় ওয়াজিব।’ (দাওয়াতে আবদিয়্যাত, পৃষ্ঠা : ১৪২, খণ্ড : ৫ এবং পৃষ্ঠা : ১৭৯, খণ্ড : ৬)

হযরত অন্যত্র লিখেছেন—

২. ‘যেসকল ব্যক্তি ইলমে দ্বীনের পঠন ও পাঠদানের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, তারা সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে ফরযে কিফায়ার দায়িত্ব পালন করছেন। যদি তারা পঠন ও পাঠদানের

এ দায়িত্ব ছেড়ে দেন তাহলে উম্মতের প্রতিটি সদস্যের ওপর এ কাজ ফরয হয়ে যাবে। তখন যদি কেউই এ দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। কাজেই সবার দায়িত্ব হলো এ জাতীয় মাদরাসাগুলোর মুহতামিমদের শোকর আদায় করা, যাঁরা তাদেরকে এই ফরজে কিফায়ার গুরুদায়িত্ব থেকে চিন্তামুক্ত করে রেখেছে। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, যেসকল লোক ইলমে দ্বীনের কাজে নিমগ্ন আছে তারা আপনাদেরই কাজে নিয়োজিত আছে। অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, ইলমে দ্বীন চর্চার পাশাপাশি জীবিকা উপার্জন চালিয়ে নেওয়া যায় না। যদি কোনো ব্যক্তি এধরনের কাজে নামে তাহলে তার পক্ষে পুরোপুরি ইলম অর্জন করা সম্ভব হবে না। কোনো ব্যক্তির পক্ষে একই সঙ্গে এমন দুটি কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, যার মাঝে পূর্ণ মনোযোগ নিবন্ধ করা প্রয়োজন।

উপরের আলোচনার সঙ্গে আরেকটি ভূমিকা যুক্ত করুন। তাহলো, কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো ব্যক্তি কাজে আটকে পড়ে তাহলে তার জীবিকার দায়িত্ব ওই লোকের ওপর বর্তায়, যার কাছে সে আটকে পড়েছে। আর বাইতুল মাল থেকে ভরণ-পোষণ দেওয়া মানেই, মুসলমানদের পক্ষ থেকে দেওয়া। উক্ত মূলনীতির আলোকে উলামায়ে কেরামের সাংসারিক খরচ যোগান দেওয়া সকল মুসলমানের যিম্মায় ফরয। সবার দায়িত্ব উলামায়ে কেরামের সেবা করা। যদি আমরা এই সেবা না করি তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে, আমাদের কাছে দ্বীনি ইলম শেখা ও শেখানোর কানাকড়ি মূল্যও নেই।' (আত-তাবলীগ : ২১/২৩৮)

হযরত এ কথাও লিখেছেন—

৩. যে সময় মুসলিম রাষ্ট্রে বাইতুল মালের ব্যবস্থাপনা ছিল, তখন বাইতল মালের পক্ষ থেকে সম্মানী দেওয়ার মাধ্যমে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করা হতো। এ কারণে দেখা যায়, ফুকাহায়ে কেরাম পরিষ্কার লিখে দিয়েছেন যে, বিচারক, উলামা, মুফতি ও এ জাতীয় ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সাংসারিক খরচ বাইতুল মাল থেকে অব্যশই প্রদান করতে হবে। কিন্তু বাইতুল মালের ব্যবস্থাপনা যখন উঠে গেছে তখন থেকে এ দায়িত্ব পালনের একটাই পদ্ধতি। তাহলো, সকল মুসলমান তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে একত্র হয়ে কিছু কিছু অর্থ এ সকল ব্যক্তিবর্গের কাছে পৌঁছে দেবেন। এটা দু' ভাবে হতে পারে। একটি হলো, মাদরাসার সুরতে। যেখানে সম্মানা-ভাতা নির্ধারিত থাকবে। আরেকটি হলো, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের সুরতে, যেখানে কোনো সম্মানী নির্ধারিত থাকবে না। সুরত যেটাই হোক, ভরণ-পোষণের এই ব্যবস্থাপনা জাতির ওপর ওয়াজিব। যদি তারা তাদের এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ত্রুটি করে তাহলে তাদেরকে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে।' (ইসলাহে ইনকিলাব, নতুন সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ১৯২, খণ্ড : ২)

দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত আলেমদের জন্যে অন্য পেশায় লিপ্ত হওয়া অনুচিত কেন? কুরআন কারিম থেকে শারয়ি দলিল

কুরআন মাজিদে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا○

'সদাকাহ ওই সকল গরীব লোকের জন্যে যারা আল্লাহ্ তাআলার পথে আবন্ধ হয়ে গেছে– জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি–মিনতি করে ভিক্ষা চায় না।' [সূরা বাকারা : ২৩]

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. এ আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন—

'জানা উচিত যে, আমাদের দেশে এ আয়াত সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য হয় ওই সকল হযরতের ওপর, যারা দ্বীনি ইলম প্রচারের কাজে নিয়োজিত। কাজেই সদকার সর্বোত্তম খাত হলো, (উলামা, আহলে মাদারিস ও) তালিবুল ইলম। কিছু কিছু অনভিজ্ঞ লোক তাদের ওপর এই সমালোচনা ছুড়ে দেয় যে, তারা অর্থ উপার্জন করে না। তাদের সেই সমালোচনার জবাব কুরআন কারিমেই দেওয়া হয়েছে। যার সারাংশ হলো, কোনো ব্যক্তির পক্ষে এক সঙ্গে এমন দুটি কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, যেই দুটি কাজ বা দুটির কোনো একটি কাজ এমন যে, তা সঠিকভাবে পালন করতে হলে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। যাদের মাঝে জ্ঞানচচার অভিরুচি আছে, তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবেন যে, এর মাঝে প্রচণ্ড মনোযোগ ও পূর্ণ অভিনিবেশ প্রদান করতে হয়। কাজেই এই ইলমচর্চার পাশাপাশি সম্পদ উপার্জনে নিমগ্ন হওয়া (অর্থাৎ ব্যবসা ইত্যাদি করে অর্থ উপার্জন করা) কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তার ইলমে দ্বীনের খেদমত অবশ্যই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এর হাজার হাজার উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে। [বয়ানুল কুরআন, সূরা বাকারা, পারা : ৩, পৃষ্ঠা : ১৬৪, খণ্ড : ১]

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. অন্য এক স্থানে লিখেছেন—

ফায়েদা : '(উপর্যুক্ত আয়াত থেকে) একটি মূলনীতি বুঝে আসে, যেই মূলনীতি ফুকাহায়ে কেরাম অনুধাবন করে তার থেকে অজস্র ছোট ছোট মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। মূলনীতিটি হলো,

'যে ব্যক্তি কারো উপকারে আটকা পড়বে, তার জীবিকা ওই ব্যক্তির ওপর আবশ্যক হবে। কাজেই উক্ত মূলনীতির আলোকেই প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর জীবিকা স্বামীর ওপর। বিচারক ও শাসকদের সম্মানী বাইতুল মাল থেকে। কারণ, মুসলিমদের সামগ্রিক স্বার্থের আবশ্যকীয়তাই এর সারাংশ।'

এখন সারকথায় আমার উত্তর হলো, উলামায়ে কেরাম ও আহলে মাদারিস যেহেতু في سبيل الله (আল্লাহর পথে) আছেন। এবং তারা এ কাজে অষ্টপ্রহর আটকে আছেন। যা উক্ত আয়াতের أُحْصِرُوا অংশের প্রতিপাদ্য। আর তারা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অর্থের মুখাপেক্ষী। যা উক্ত

আয়াতের لِلْفُقَرَاءِ অংশের প্রতিপাদ্য। কাজেই তাঁদের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা সকল মুসলমানের যিম্মায় ওয়াজিব। কারণ আয়াতের শুরুতে الْفُقَرَاءِ শব্দের আগে ل (লাম) বর্ণ এসেছে। যা হক বোঝায়। কাজেই সকল মুসলমানের অবধারিত দায়িত্ব হলো, তারা তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। এই ব্যয়ভার সম্মানী–ভাতা নির্ধারণের মাধ্যমেও হতে পারে, যেমন মাদরাসার মুদাররিস ও ওয়ায়েযিনদের সম্মানী; আবার নির্ধারণ না করেও হতে পারে, যেমন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারীদের সেবা।'

ফায়েদা : এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, যারা দ্বীনের তালীমের খেদমতে ব্যস্ত, এমন লোকদের জন্যে উচিত হলো, তারা জীবিকা উপার্জনের কোনো পেশা (ব্যবসা ইত্যাদিতে)এর মাঝে বিলকুল লিপ্ত হবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ সে দিকেই ইঙ্গিত করে।

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আরেকটি সংশয়েরও অবসান হচ্ছে, যা জনগণের পক্ষ থেকে উলামায়ে কেরামের ওপর আরোপিত হয়। তাহলো, আলেমরা পার্থিব অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে অক্ষম। উক্ত আয়াত থেকে বুঝে আসে যে, এই অক্ষম হওয়া তাদের জন্যে আবশ্যক। কারণ হলো, এক ব্যক্তির পক্ষে একই সাথে দুটি দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। বিশেষত, দুটি কাজের মধ্য হতে একটি যদি এমন হয় যে, পুরোটা সময় সেই কাজে ব্যয় করা আবশ্যক। এই লিপ্ততা হাতের মাধ্যমেও হতে পারে, মুখের মাধ্যমেও হতে পারে, মনে–মনেও হতে পারে। দ্বীনের খেদমত নিঃসন্দেহে এমন গুরুদায়িত্ব। দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়াটা অর্থ উপার্জনের মাধ্যম নয়। তাকে যেই সম্মানী দেওয়া হচ্ছে, তা দ্বীনের খেদমতে তার আটকে যাওয়ার বিনিময় হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। (হুকুকুল ইলম, পৃষ্ঠা : ১৪-১৫, থানাভবনে মুদ্রিত। লেখক : হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ.)

ফায়েদা : হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. বলেন—

'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ যাদের মাঝে অন্য কাজ করার শক্তি নেই। শক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শারঈ শক্তি নেই। অর্থাৎ তাদের জন্যে অন্য কাজে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। মাসআলাটি আমি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাদের এলাকার এক সরকারি কর্মচারী একটি ছাপাখানা খুলে। যখন সেই সংবাদ স্থানীয় প্রশাসকের কাছে পৌঁছে তখন সে তার নামে এ পরোয়ানা জারি করে যে, হয়তো তুমি চাকরি থেকে পদত্যাগ করবে, নয়তো এই ছাপাখানা বন্ধ করবে। বলুন, এই পরোয়ানা জারি করার কারণ কী? কারণ একটাই। তাহলো, ছাপাখানা থাকলে সে চাকরির দায়িত্ব পুরোপুরি আঞ্জাম দিতে পারবে না। (দাওয়াতে আবদিয়াত, ফাযায়েলে ইলম : ৭/৪০)

সম্মানী না নিয়ে পড়ানোর মানসিকতা শয়তানের প্রবঞ্চনা

আশরাফ আলী থানবি রহ. বলেন—

‘এক মৌলভি সাহেবের আবেগ উঠল যে, (মাদরাসার সম্মানী ও) চাকরি ছেড়ে দেবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, চাকরি ছাড়ার পরও ইলমে দ্বীনের খেদমত চালিয়ে যাবে, না কি বাদ দেবে? বলল, স্রেফ আল্লাহর জন্যে খেদমত করব (অর্থাৎ বিনা বেতনে ফি সাবিলিল্লাহ পড়াব)। আমি বললাম, আমি ভবিষদ্বাণী করে দিচ্ছি যে, আপনার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হবে না। কিছু ক্ষণ ভাবার পর বলল, জ্বি হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন। আমি বললাম, এখন তো চাকরি ও বেতনের কারণে কিছু কাজও করছ। কিছুটা মানুষের কথা ভাবছ। খিয়ানত ইত্যাদির ভয়েও সন্ত্রস্থ থাকছ। চাকরি ছেড়ে দিলে তো এগুলোর কোনোটাই থাকবে না। এমন মানুষ কদাচিৎ পাবে।’ (হুসনুল আযিয : ২/২৬৫)

হাকিমুল উম্মত রহ. আরেক জায়গায় লিখেছেন—

تھوڑے روز ہوئے ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے ان کے نفس نے یہ تجویز کیا تھا کہ نوکری (اور تنخواہ) چھوڑ کر اللہ کے واسطہ پڑھائیں، اس لئے کہ تنخواہ لینے سے خلوص نہیں رہتا، میں نے ان سے کہا یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطان نے دیکھا کہ یہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان سے یہ کام کسی تدبیر سے چھڑانا چاہئے، تو اگر یہ کہتا کہ پڑھانا چھوڑ دو، تو اس کی ہرگز نہیں چلتی، اس لئے اس کی وہ صورت تجویز کی جو دینداری کے رنگ میں ہے کہ اس میں خلوص نہیں ہے، نوکری چھوڑ کر پڑھاؤ، تو سمجھ لو کہ ابھی تو تنخواہ کی وجہ سے چابندی سے کام بھی ہو رہا ہے، اور اگر نوکوی چھوڑ دوگے (یعنی بلا تنخواہ پڑھاؤگے) تو پابندی تو ہوگی نہیں، رفتہ رفتہ پڑھانا بھی چھوٹ جائے گا، اور شیطان کامیاب ہو جائے گا، اس لئے نوکری (یعنی تنخواہ لینا) ہرگز مت چھوڑو۔ (دعواتِ عبدیت ص: ۳۱، ج: ۳، وعظ ذمِّ ہوی)

‘কিছু দিন আগে এক মৌলভি সাহেব আমার কাছে আসে। তার অন্তর তাকে এ প্রস্তাব দিয়েছে যে, চাকরি (ও সম্মানী) ছেড়ে স্রেফ আল্লাহর ওয়াস্তে পড়াবে। কারণ, সম্মানী নিলে ইখলাস থাকে না। আমি তাকে বললাম, এটা শয়তানের প্রতারণা। শয়তান দেখল, এ লোক দ্বীনের মেহনতে লেগে আছে। যেভাবেই হোক, তাকে এ কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। এখন যদি শয়তান তাকে বলে যে, পড়ানো ছেড়ে দাও তাহলে কিছুতেই সে তার কথা মানবে না। এ জন্যে শয়তান তার সামনে এমন প্রস্তাব ছুড়েছে, যার ওপর দ্বীনদারির প্রলেপ মাখা আছে। তা হলো, এভাবে পড়ানোর মাঝে ইখলাস নেই। কাজেই চাকরি ছেড়ে দাও। ভালো করে বুঝুন, এখন তো বেতনের কারণে নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গেও দায়িত্ব পালন করতে পারছেন। যদি চাকরি ছেড়ে দেন (অর্থাৎ বিনা বেতনে পড়ান) তাহলে পূর্বের নিয়মানুবর্তিতা আর থাকবে না। ধীরে ধীরে পড়ানোও ছেড়ে দেবেন। এভাবে শয়তান সফল হবে। কাজেই চাকরি (অর্থাৎ সম্মানী নেওয়া) কখনই ছাড়বে না।’ (দাওয়াতে আবদিয়্যাত, পৃষ্ঠা : ৩১, খণ্ড : ৩, ওয়াযে যাম্মুল হাওয়া)

ধনী আলেমেরও উচিত সম্মানী নিয়ে পড়ানো

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবি রহ. বলেন—

‘আমার অভিমত হলো, আলেম যদি ধনীও হয় আর প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মানী পায় তখনও তার দায়িত্ব হলো, সে সবেতনে পড়াবে। যদি তার মাঝে ধনাঢ্যতার আবেগ উথলে ওঠে তাহলে সে যেন সেই সম্মানী মাদরাসায় দান করে; কিন্তু অবশ্যই যেন সম্মানী গ্রহণ করে। যেন নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে খেদমত আঞ্জাম দেয়। আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, বিচারক যদি বড় ধনীও হয় তারপরও তার দায়িত্ব হলো, সম্মানী নেবে। তার কারণ হলো, যদি বিচারক সম্মানী না নেয় আর এভাবে দশ বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করে। এরপর কোনো গরিব যদি বিচারকের দায়িত্ব লাভ করে তখন পুনরায় সম্মানী চালু করা কঠিন হয়ে পড়বে। সুবহানাল্লাহ! আমাদের ফকিহগণ কতটা গভীর চিন্তাশীল ছিলেন! তারা আদতেই বাস্তবদর্শী ছিলেন!’ (দাওয়াতে আবদিয়্যাত ওয়াযে যাম্মে হাওয়া, পৃষ্ঠা : ৩১, খণ্ড : ৩)

একটি অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবি বলেন—

‘একদিন আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। এক বয়স্ক মহিলা তার ঘরের দরোজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিচ্ছিল। আমাকে দেখে বললেন, বেটা, এদিকে এসো। আমি গেলাম। তিনি আমাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। আমি জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি ওই কাঠব্যবসায়ী আলেমকেও মাসআলাটি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনিও তোমার কথার অনুরূপ উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কথার ওপর আমি আস্থা রাখতে পারছিলাম না এ কারণে যে, সম্ভবত তিনি তার স্বার্থের দিকে তাকিয়ে বলছেন। এখন তোমার কাছ থেকে শুনে আমি নিশ্চিত হলাম। আমি পৌঢ় মহিলাকে বললাম, আলেমদের সম্পর্কে এমন কুধারণা পোষণ করা জায়েয নয়।

এ হলো দুনিয়াবি কাজে আলেমদের লিপ্ততার পরিণতি। তখন মাসআলার ক্ষেত্রে তাদের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। তাদের দুনিয়াদারির কারণে এ অনিষ্টতা দেখা দেয় যে, খোদ আপনারাও তাদের ফতোয়া ও তাদের ওয়াযের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলবেন।’ (আত তাবলীগ : ৬৯)

“সম্মানী নিয়ে পড়ানোও দ্বীনের খেদমত এবং সম্মানী নিয়ে পড়ানো ব্যবসা থেকেও উত্তম”
শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. এর স্পষ্ট বয়ান

শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. লেখেন—

> ‘আমার মতে (সবধরনের জীবিকার মধ্য হতে) পেশা হিসেবে ব্যবসা উত্তম। কারণ হলো, ব্যবসার মাঝে ব্যক্তি নিজের সময়ের মালিক হয়ে থাকে। এ সুযোগে সে পাঠ গ্রহণ, পাঠদান, ফতোয়া প্রদান ইত্যকার খেদমতও আঞ্জাম দিতে পারবে। কাজেই দ্বীন শিক্ষা দিয়ে জীবিকা উপার্জন যদি দ্বীনি কর্মকাণ্ডগুলোর জন্যে হয় তাহলে তা তিজারত থেকেও উত্তম। কারণ, বাস্তবেই তা দ্বীনের কাজ। তবে শর্ত হলো, এ কাজটাই উদ্দেশ্য হতে হবে এবং নিরুপায় হয়ে সম্মানী গ্রহণ করছে, এমন হতে হবে। আমাদের আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের সিংহভাগই এমন নীতি অবলম্বন করেছেন। এমনটি তখনই হবে, যখন ব্যক্তি মেহনতকে আসল কাজ মনে করবে আর সম্মানীকে আল্লাহর দান জ্ঞান করবে।.... যদি কেউ এ শর্ত পালন করতে পারে তাহলে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে জীবিকা উপার্জন আয়ের যেকোনো প্রকার থেকে সর্বোত্তম হবে। (ফাজায়েলে তিজারত : ৫২)

‘সম্মানী ছাড়া পড়াবে, এমন শিক্ষক রাখা অনুচিত’
শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. এর সিদ্ধান্ত

শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন—

> বিগত কয়েক বছর যাবত আমার অভ্যাস হলো, আমি সবসময় মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে এ পরামর্শ দিয়ে থাকি যে, সম্মানী ছাড়া কোনো শিক্ষক রাখবেন না। আমি আমার নিজের মাদরাসার অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের বলছি, প্রথম দিকে আমি মাযাহিরুল উলূমে ‘মুঈনুল মুদাররিস’ বা সহকারী শিক্ষক’ নামে একটি স্তর শুরু করি। যেখানে কাউকে মাদরাসার এক-দু সবক পড়ানোর দায়িত্ব দিতাম। অবশিষ্ট সময় তাকে তার কোনো বাণিজ্যিক কাজ করার পরামর্শ দিতাম। কিন্তু দেখা গেল, এক বছরের মাথায় আমি দেখতে পেলাম, তাদের মাঝে পড়ানোর প্রতি আগ্রহ কম; কিন্তু বাণিজ্যের প্রতি অধিক ঝোঁক লক্ষ্য করলাম। আস্তে আস্তে দ্বীনের মেহনত তারা হাতছাড়া করে ফেলে। আর সম্মানী বিহীন শিক্ষক যেই অমনোযোগের সঙ্গো মেহনত করে, সম্মানীভুক্ত শিক্ষক তেমন করে না। আমাদের মহান পূর্বসূরিদের সম্পর্কে আমরা যেই বিখ্যাত কথাটি শুনে আসছি যে, তারা শিক্ষাকেন্দ্রিক মেহনতের পাশাপাশি এক-আধটু ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন, আমি মনে করি, তাদের সঙ্গো আমাদের নিজেদেরকে তুলনা করা ঠিক হবে না। তাদের তাওয়াক্কুলের মেজায এতোটাই প্রখর ছিল যে, তারা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত হতেন। এই লিপ্ততা কখনই তাদেরকে দ্বীনি কাজ থেকে সরিয়ে দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত করত না। তারা সবসময় তিজারতকে দ্বীনি তালিমের অনুগত রাখতেন। স্রেফ যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু পরিমাণ তিজারত করতেন।
>
> কিন্তু বর্তমান জামানার অবস্থা হলো, কেউ যদি মাদরাসায় পড়ানোর পাশাপাশি তেজারত বা অন্য

কোনো মাধ্যম অবলম্বন করে অর্থোপার্জন শুরু করে তাহলে সে তার দ্বীনি দুর্বলতা ও তাওয়াক্কুলের কমতির কারণে সম্পূর্ণ মনোযোগ দুনিয়ার প্রতি উপুড় করে ঢেলে দেয়। তালীম ও পাঠদান থেকে তার মন পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে আমি সবসময় দ্বীনি মাদারিসের মাঝে কারিগরি বিদ্যা ও দুনিয়াবি পেশা অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে শক্ত দ্বিমত জানিয়ে থাকি। কারণ হলো, এখন পর্যন্ত মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকগণ মন দিয়ে বা আধা মন নিয়ে যেই অল্প–বিস্তর তালীমি মেহনত করছেন, মাদরাসার চৌহদ্দিতে কারিগরি বিদ্যা ও দুনিয়াবি পেশা চলে আসার পর সেটাও বিদায় নেবে। (ফাজায়েলে তিজারাত : ৫২ ও ৫৮)

এ কথাটাকে হযরত শাইখ রহ. মুয়াত্তা মালেকের ওপর তার অনবদ্য হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ اوجز المسالك (আওজাযুল মাসালিক) এর ভূমিকায়ও উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন–

إن ما أكثر لا يأخذون الأجر فى زماننا لا يهتمون بالدروس ويضيعونها و يعطلون أوقاتهم و أوقات الطلبة ظنا منهم أنهم على أمن من النكير عليهم فهذا أشد من الأول ولمثل هولاء فالأجرة متعين عليهم. (مقدمة اوجز المسالك : ٧٧)

‘বর্তমান যুগে যারা সম্মানী নেয় না, তাদের সিংহভাগ পাঠদানের প্রতি মনোযোগী নয়। তাদের কারণে পাঠদান বিঘ্নিত হয়। তারা তাদের নিজেদের সময় ও ছাত্রদের সময় বিনষ্ট করে এই মানসিকতার কারণে যে, কেউ তো তাদের কাছে জবাবদিহিত চাবে না। নিজেকে এভাবে জবাবদিহির আওতামুক্ত মনে করাটাই প্রথম সুরতের চেয়ে বেশি খারাপ। এ জাতীয় কারণেই তাদের ওপর সম্মানী ধার্য্য করা অত্যাবশ্যক।’ (আওজাযুল মাসালিক : ৭৭)

সম্মানী গ্রহণ প্রসঙ্গে দারুল উলুম দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলূমের আকাবির মনীষার ঐতিহ্য

এ কারণেই সবসময় আমাদের দেওবন্দ ও সাহারানপুরের আকাবির আলেমগণের অভ্যাস ছিল যে, তারা সম্মানী গ্রহণ করতেন। তারা সবসময় সম্মানী নিয়েই দ্বীনের পাঠদানের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা নিচে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি, যেখানে কয়েকজন আকাবির শীর্ষস্থানীয় আলেমের সবসময়ের কর্মপন্থা তুলে ধরা হলো।

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. লিখেছেন–

‘আমার হযরত (হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ.– যিনি আবু দাউদের ওপর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন) মাযাহিরুল উলূমে তার সর্বশেষ সম্মানী ছিল, চল্লিশ রুপি।’

‘আর দারুল উলূম দেওবন্দে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. এর সর্বশেষ সম্মানী ছিল পঞ্চাশ রুপি। এ দু’জন অর্থাৎ হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপ্রি ও হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.এর কাছে যতবারই মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ও উপদেষ্টাগণ সম্মানী বাড়ানোর প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ততবারই তাঁরা দু’জনই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সেই প্রস্তাব ঠুকরে দিয়ে বলতেন যে, বর্তমান সম্মানীই আমাদের সক্ষমতা থেকে বেশি।’

‘হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. প্রথম জীবনে দশ রুপি বেতনে শিশুদেরকে পড়ানোর চাকুরি করেছেন।’

‘আর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুঈ রহ. সম্পর্কেও এ আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তিনি কিছু দিন হাদিস পড়ানো ও বইয়ের প্রুফ দেখার সম্মানী গ্রহণ করেছেন।’ (ফাজায়েলে তিজরত : ৫৩-৫৯)

'হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. কানপুরের মাদরাসায়ে ফয়জে আমে ২৫ রুপি বেতনে নিয়োগ পেয়েছিলেন।' (আশরাফুস সাওয়ানেহ : ১/৩৭)

'সাহারানপুরের ফিকাহবিদ মাওলানা সাআদাত আলি মাওলানা সাখাওয়াত আলি আম্বেটিকে মাসিক তেরো র্পি বেতনে শিক্ষক পদে নিয়োগ দান করেন, তিনি ইতোপূর্বে আম্বেঠায় পড়াতেন।' (তারিখে মাযাহির : ১/৫)

'১২৩৮ হিজরির শাওয়াল মাস থেকে হযরত মাওলানা মাযহার নানুতুঈ রহ.কে ত্রিশ রুপি মাসিক বেতনে প্রথম শিক্ষক পদে নিয়োগ দান করেন।' (তারিখে মাযাহির : ১/৫, মাযাহিরুল উলূম কে বুনিয়াদি মাকাসি আকাবিরে মাযাহিরে উলুমে রাহনুমা খুতুত কি রোশনি মেঁ)

'হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব রহ. সম্পর্কে মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব লেখেন,

দারুল উলূম দেওবন্দে যখন তিনি শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করেন তখন তার প্রাথমিক সম্মানী নির্ধারিত হয় মাসে ১৫ রুপি। যখন ১৩৬২ হিজরিতে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ইস্তফা নেন তখন তার সম্মানী বৃদ্ধি পেয়ে মাসিক ৬৫ রুপিতে উন্নীত হয়েছিল।' (মেরে ওয়ালিদ মেরে শায়খ : ১৩)

'হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ গাঙ্গুহি রহ. মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরে ১৩৫১ হিজরিতে মাসিক দশ রুপি বেতনে নিয়োগ লাভ করেছিলেন।' (হায়াতে মাহমুদ : ২৪৭)

'ইসলামি চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. নদওয়াতুল উলামায় ১৯৩৪ হিজরিতে ৪০ রুপি বেতনে নিয়োগ লাভ করেছিলেন।' (কারওয়ানে যিন্দেগি : ১/১৩৯)

অল্প বেতনে পড়ানো সাহারানপুরের আলেমদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য

মাযাহেরে উলুম সাহারানপুরের আকাবিরগণ সর্বদা সম্মানী নিয়ে পড়িয়েছেন। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল অল্প বেতনে পড়ানো। তবে কখনও বিনা বেতনে পড়াতেন না। উদাহরণ স্বরূপ 'উলামায়ে মাযাহেরে উলুম সাহারানপুর আওর উনকি ইলমি ওয়া তাসনিফি খিদমাত' থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি।

'সর্বযুগে মাযাহিরে উলূমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এখানকার দায়িত্বশীল আসাতিযায়ে কেরাম ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্বল্প সম্মানীতে কাজ করেছেন। তাঁরা আসল বিনিময় ও সত্যিকারের প্রতিদান মহান আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করার প্রত্যাশা করতেন।... একদম শুরুর যুগ থেকেই মাযাহিরে উলূমের এ বৈশিষ্ট্য ছিল। এখানে খুবই সংক্ষেপে কয়েকজন মনীষীর আলোচনা তুলে ধরছি—

১. দ্বিতীয় উসতায মাওলানা আহমদ হাসান সাহেব ১২৮৭ হিজরিতে মাত্র ১৫ রুপি বেতনে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

২. ১২৮৭ হিজরিতে মাত্র ৩ রুপি বেতনে মাওলানা হাফেয কমরুদ্দিন সাহেব রহ. নিয়োগ লাভ করেন। এখানে তিনি ৪৭ বছর দ্বীনের খেদমত করেন। তাঁর সর্বশেষ সম্মানী ছিল মাত্র ২০ রুপি।

৩. মাওলানা এনায়েত ইলাহি সাহেব মাযাহিরে উলূমে ১২৮৯ হিজরিতে নিয়োগ লাভ করেন। ১৩৪৭ হিজরিতে ইনতিকালের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের অবসান ঘটে। তিনিও সবসময় স্বল্প বেতনে খেদমত করেছেন। প্রাথমিক নিয়োগের সময় তাঁর সম্মানী ছিল ৫ রুপি। আর সর্বশেষ

সম্মানী ছিল ৪৫ রুপি।

৪. ১২৯৭ হিজরিতে মাওলানা আহমদ আলি মুরাদাবাদি সাহেব যখন তৃতীয় শিক্ষক পদে যোগদান করেন তখন তাঁর সম্মানী নির্ধারিত হয় ১০ রুপি।

৫. মাযাহিরে উলূমে মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ. এর সম্মানী ছিল ৪০ রুপি।

৪. মাযাহিরে উলূমের সাবেক উসতাযুল হাদিস ও মুহতামিম মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেব ১৩২৩ হিজরিতে ১০ রুপি বেতনে নিয়োগ লাভ করেন। ১৩৭৩ হিজরিতে তিনি যখন ইনতিকাল করেন তখন তাঁর সর্বশেষ সম্মানী ছিল ১৬১ রুপি।

৫. হযরতুল আকদাস শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. ১৩৩৫ হিজরিতে ১৫ রুপি মাসিক বেতনে যোগদান করেন।

৬. মাযাহিরে উলূমের আরেক উসতায মাওলানা আলহাজ্ব শাহ মুহাম্মদ আসআদুল্লাহ। তিনি ১৩৩৮ হিজরিতে ১৫ রুপি বেতনে নিয়োগ লাভ করেন।' (উলামায়ে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর আওর উনকি ইলমি ও তাসনিফি খেদমত : ২০৬-২০৯)

৯. শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস সাহেব রহ. ১৩৮১ হিজরিতে সহকারী শিক্ষক পদে যখন যোগদান করেন তখন তাঁর সম্মানী ৭ রুপি নির্ধারিত হয়। ১৩৮৩ হিজরিতে শুধু ৩০ রুপি (খাবার পাবে না) শর্তে নিয়োগ স্থায়ীত্ব লাভ করে। (শায়খ ইউনুস রহ. কি কাহানি, খোদ উন কি যুবানি, তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে আরমোগান আগস্ট ২০১৭ সংখ্যা, পৃষ্ঠা – ১১)

১০. মাওলানা সিদ্দিক আহমদ বান্দাভি রহ. ১৯৪৬ ঈসাব্দে মাদরাসায়ে ইসলামিয়া ফতেহপুরে যোগদান করেন। তখন তাঁর সম্মানী ধরা হয়েছিল ২৬ রুপি। (তাযকিরাতুস সিদ্দিক : ১/২৫০)

সারকথা

খুলাফায়ে রাশেদিন ও অপরাপর সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর কর্মপন্থা, ইসলামের শীর্ষস্থানীয় সকল ফকিহের স্পষ্ট বক্তব্য, দেওবন্দ ও সাহারানপুরের সকল আকাবির রহ. এর উপরোল্লেখিত স্পষ্ট বিবরণ ও মহান পূর্বসূরিদের কর্মপন্থা সামনে রেখে আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে,

* দ্বীনি মাদরাসাগুলোর দায়িত্বশীল উলামায়ে কেরামের জন্যে কোনটি সমীচিন হবে?

* তাঁদের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পৃক্ত হওয়াটাই সঙ্গত হবে? না এর বিপরীত পথে থাকতে হবে?

* বিনা বেতনে পড়ালে কি কি লাভ হবে? এবং বিনা বেতনে পড়ালে কি কি ক্ষতি হবে?

* মাওলানা সাদ সাহেব যে বলেছেন, উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হলো, নিজেদের ভেতরে জামিইয়্যাত তথা সামগ্রিক পূর্ণতা সৃষ্টি করা। দাওয়াত, তা'লীম ও তেজারত— এ তিন কাজ করলে জামিইয়্যাত তথা সামগ্রিক পূর্ণতা সৃষ্টি হবে। নয়তো সে অকর্মণ্য সাব্যস্ত হবে।' মাওলানা সাদ সাহেবের এ জাতীয় কথা কতটুকু সঠিক?

* উলামায়ে কেরামের জন্যে মাওলানা সাদ সাহেব জামিইয়্যাত তথা সামষ্টিক পূর্ণতার যেই মানদণ্ড বেশ জোরেশোরে বলে বেড়াচ্ছেন, সেই মানদণ্ড কে দাঁড় করিয়েছে?

আমাদের আকাবির-আসলাফ রহ. তো সম্মানী নিয়েই পড়িয়েছেন। তাঁরা তো মাদরাসার শিক্ষকতার পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য করেননি। তাহলে কি সাদ সাহেবের ভাষ্যমতে তাঁরা জামিইয়্যাত তথা সামগ্রিক পূর্ণতার মানদণ্ড উতরাতে পারেননি! তাঁরা সবাই কি তাহলে অকর্মণ্য ছিলেন! হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. হযরত মাওলানা আসআদুল্লাহ সাহেব রহ. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ.

হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ. শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. মাওলানা সিদ্দিক আহমদ বান্দাভি রহ. সহ আমাদের সকল আকাবির আসলাফ রহ.—যাঁরা পাঠদান ও শিক্ষকতার মহান কাজে তাঁদের সমগ্র জীবন উজাড় করেছেন— বলুন তাঁদের মাঝে কি জামিইয়্যাত তথা সামগ্রিক পূর্ণতা ছিল না? 'তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেননি' এ কারণে কি তাঁরা নাউজুবিল্লাহ অকর্মণ্য ছিলেন? শ্রোতামণ্ডলীর ওপর মাওলানা সাদ সাহেবের এ জাতীয় বয়ান কী ধরনের প্রভাব ফেলবে?

তার এ জাতীয় বয়ানগুলোর কারণে কি উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসা সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে জনগণের অন্তরে কুধারণা সৃষ্টি হবে না? তিনি এ জাতীয় বয়ান দিয়ে উম্মতকে কোন পথে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন? দাওয়াত ও তাবলীগের মহান পূর্বসূরি ও আকাবির হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. ও হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. কি এ ধরনের চিন্তাধারা লালন করতেন? এ দু' হযরতকেও কি নিকম্মা বা অকর্মণ্য বলা যাবে? বর্তমান সময়ে দাওয়াত ও তাবলীগের বিভিন্ন মারকাযে, খোদ নিযামুদ্দিনে এমন অনেক আলেম ও বুযুর্গ রয়েছেন, যাঁরা একসঙ্গে পাঠদান ও ব্যবসা-বাণিজ্য করেন না। তাঁদের সম্পর্কেও কি এ কথা বলা সমীচিন হবে যে, তাঁরা যেহেতু নিজেদের মাঝে জামিইয়্যাত তথা সামগ্রিক পূর্ণতা সৃষ্টি করতে পারেননি, কাজেই তাঁরা নিকম্মা বা অকর্মণ্য?

যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে আকাবির ও আসলাফ রহ. সম্পর্কে কেন এ জাতীয় কথা বলা হচ্ছে? এ ধরনের ভুয়া ইজতিহাদ ও বিভ্রান্তিকর দলিলবাজি করে উম্মতকে কিসের বার্তা দেওয়া হচ্ছে? কেন এখন সাধারণ মানুষদের উপস্থিতিতে এ জাতীয় বিভ্রান্তিকর বয়ানগুলো পেশ করা হচ্ছে, যার ফলে তার ভক্ত ও অনুসারীরা সেগুলো নকল করে অন্যদের কাছে পৌঁছাচ্ছে? এ ধরনের বিভ্রান্তিকর বয়ান করে করে উম্মতকে যেভাবে দ্বীনের প্রকৃত সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে গুমরাহির গহ্বরে ফেলা হচ্ছে, সেই বিশাল ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার পথ কী?

কাজেই বর্তমান সময়ের উলামায়ে কেরাম, গুণীজন ও মনীষীদের দায়িত্ব হলো, তাঁরা বর্তমান সংকট সম্পর্কে অবশ্যই গভীর মনোনিবেশে চিন্তা-ভাবনা করবেন এবং এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাব্য সকল পথে প্রয়াস করবেন ও সংকটের মুখ বন্ধ করার কার্যকর কৌশলগুলো উম্মতের সামনে তুলে ধরবেন।

প্রতিপক্ষের দলিলগুলোর নিরীক্ষণ,
তারা কেন ভুল বুঝল?

এতক্ষণ আমরা যে উদ্ধৃতিগুলো পেশ করেছি, তার আলোকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কুরআন কারিম, হাদিসে রাসূল, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত, সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর কর্মপন্থা, সর্বযুগের সকল ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের স্পষ্ট বয়ান ও নিকট অতীতের আকাবির মনীষা রহিমাহুমুল্লাহুর কর্মপন্থার আলোকে খুব ভালোভাবে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে জিহাদ করা, সদকা ও যাকাত সংগ্রহ করা ও দ্বীনি-শরঈ ইলম শিক্ষা দিয়ে সম্মানী-ভাতা গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে জাইয। এতে সামান্যতম কারাহাত (অপ্রিয়তা)-ও নেই। এই বিনিময় গ্রহণ করাটা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদান প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধক নয়। এই সম্মানী নেওয়াটা তাওয়াককুল, তাকওয়া ও যুহদের পরিপন্থীও নয়। যদি তাই হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদিন, অপরাপর সাহাবায়ে কেরাম রাদি. ও আমাদের আকাবির-আসলাফের জীবনে সম্মানী গ্রহণের মতো কাণ্ড ঘটত না। সম্মানী নেওয়া শরিয়তের মেজায পরিপন্থী হলে সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরাম ও অপরাপর সাহাবিগণই তা পরিহার করতেন। অথচ আমরা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদি.-ই দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে নিয়মিত সম্মানী-ভাতা গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের আকাবির উলামায়ে কেরামও তাঁদের সেই আদর্শ অনুসরণ করেছেন।

শরিয়তের এত অসংখ্য দলিল ও উম্মাহর সর্বযুগের চিরন্তন কর্মপন্থার বাইরে গিয়ে কেউ যদি জোরেশোরে এমন দাবী তোলে যে, 'বিনা বেতনেই দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিতে হবে। কেননা সম্মানী ও সাওয়াব এক জায়গায় একত্র হতে পারে না। ما أسئلكم عليه من أجر। সম্মানী-বিনিময় নিয়ে দ্বীনের খেদমত করা দ্বীন নয়; বরং নিজের প্রয়োজন পূরণ মাত্র। দ্বীনের খেদমত তখনই হবে যখন বিনা বেতনে পড়াবে ও জীবনের আর্থিক সক্ষমতা পূরণের জন্যে ব্যবসা করবে। উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হলো, তা'লিম, তাবলীগ ও তিজারত– একসঙ্গে তিন দায়িত্ব পালন করা। নয়তো তারা অকর্মণ্য সাব্যস্ত হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।'

নিঃসন্দেহে সাদ সাহেবের এই চিন্তাধারা ও মানসিকতা খুবই বিপদজনক ও সীমাহীন অজ্ঞতার ফসল। তিনি এই বক্তব্যের মাধ্যমে আদতে সকল সাহাবায়ে কেরাম, উম্মতের সকল আকাবির-আসলাফ ও মুজতাহিদদের ওপর বিদ্রূপ, নিন্দা ও এ কুধারণা দাগানোর দরোজা খুলেছেন যে, ওই সকল হযরত দ্বীনের কোনো খেদমতই করেননি। কেননা তাঁরা তো সম্মানী নিয়ে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দেওয়াকে সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কারের পরিপন্থী মনে করতেন না। এজন্যে তাঁরা আজীবন সম্মানী গ্রহণ করেছেন।

যারা এ ধরনের চিন্তাধারা ও মানসিকতা লালন করে তাদের কাছে কোনো উল্লেখযোগ্য শরঈ দলিল বা গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই। তাদের অভ্যাসই হলো, নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ও মূর্খতাসৃষ্ট কথাবার্তা বলে বেড়ানো আর সেটাকে শরঈ দলিলের মর্যাদা দেওয়া। এরা নিজেদেরকে মুজতাহিদ ইমামের আসনে বসিয়ে, নিজেকে মুজতাহিদ মনে করে, বিভিন্ন হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের ঘটনা থেকে ভুল দলিলবাজি করে। তাজ্জবের বিষয় হলো, এ ধরনের কাজ এমন লোকজন করে বেড়াচ্ছে, যারা কোনো ইজতিহাদের উসূল ও মূলনীতির গন্ধ শুঁকে দেখেনি, ইজতিহাদ, কিয়াস ও উদ্ভাবনের তাত্ত্বিকতার সঙ্গে যাদের দূরতম সম্পর্কও

নেই। তারা ইজতিহাদের গলি-ঘুপচি সম্পর্কে বিলকুল নাদান। তারা হাদিসের কিছু উরদু অনুবাদের বই পড়ে, নিজেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে, সাহাবায়ে কেরাম ও মুজতাহিদ ইমামদের বিরুদ্ধে ভুল ও বিভ্রান্তিকর কথা ছড়িয়ে উম্মতের মন-মস্তিষ্ককে কলুষিত ও দুর্গন্ধময় করছে। আমাদের এ বইয়ের আলোচিত মাসআলার ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আমরা একে একে প্রতিটি বিভ্রান্তিকর দলিলের অবস্থান আপনাদের সামনে তুলে ধরব—

১.

মুসলিম শরিফ ও মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে বর্ণনাটি রয়েছে। হায়াতুস সাহাবা গ্রন্থে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. বর্ণনাটি নকল করেছেন। শিরোনাম দিয়েছেন, 'বিনিময় নিয়ে জিহাদ করা'। সেই শিরোনামের অধীনে তিনি হাদিসটি নকল করেছেন।

হাদিসটি হলো, হযরত আওফ ইবনে মালিক রাদি. বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করেন। তখন এক লোক এসে বলল, আমি তোমার সঙ্গে এ শর্তে যাব যে, তুমি আমার জন্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে একাংশ দেবে। কিছুক্ষণ পর লোকটি বলল, আল্লাহর কসম, তোমরা গনিমতের মাল পাবে, কি পাবে না, তা আমার নিশ্চিত জানা নেই। কাজেই আমার জন্যে একটি নির্ধারিত অংশ বরাদ্দ করে দাও। আমি তার জন্যে তিন স্বর্ণমুদ্রা নির্ধারণ করলাম। এরপর আমরা যুদ্ধ করলাম। যুদ্ধশেষে আমাদের হাতে মালে গনিমত এলো। আমি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি আমাকে বলেন, এ লোক যেই তিন স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছে, তা ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতে আর কিছুই পাবে না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ লিল হায়সামি : ২২৩, হায়াতুস সাহাবা : ১/৬২৭)

হায়াতুস সাহাবা গ্রন্থে হযরত ইয়া'লা ইবনে মুন-ইয়া (يعلى بن مُنْيَة)-এর সূত্রে এ ধরনের আরেকটি হাদিসও নকল করা হয়েছে।

মাওলানা সাদ সাহেবসহ কতিপয় তাবলীগি যিম্মাদার এ ধরনের হাদিস বয়ান করে, তা দিয়ে এ দলিলবাজি করে যে, 'বিনিময় নিয়ে জিহাদকারীর বিধান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতে ওই লোক এই তিন স্বর্ণমুদ্রা ব্যতিরেকে কিছুই পাবে না।' অথচ উক্ত হাদিস দিয়ে নিঃশর্তে, গণআকারে এমন ফলাফল বের করা সঠিক নয়। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে—

১. এ হাদিসে সর্বপ্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, সম্মানী বা বিনিময় নিয়ে জিহাদ করা যদি নিঃশর্তভাবে শরিয়তপরিপন্থী বা সাওয়াব ও পরকালীন বিনিময়ের পরিপন্থী হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ হযরত আউফ ইবনে মালিক রাদি. ও হযরত হযরত ইয়া'লা ইবনে মুন-ইয়াকে নাকচ করে বলতেন যে, এভাবে তাকে পারিশ্রমিক দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া তোমাদের জন্যে উচিত হয়নি। কেননা এটি ভুল কাজ, বা নিদেনপক্ষে সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কারের পরিপন্থী। আর ভুল কাজে সহায়ত করাও ভুল। যদি এই কাজ অর্থাৎ বিনিময় নিয়ে জিহাদ করা শরিয়ত অনুসারে ভুল বা নিদেনপক্ষে সাওয়াব ও প্রতিদানের পরিপন্থী হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রাদি. কখনই এ ধরনের পদক্ষেপ নিতেন না এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই সেই পদক্ষেপ নাকচ করে দিতেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদি.এর এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাকচ না করাটা খোদ এ কথার পক্ষে স্পষ্ট দলিল যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি কোনো মন্দ কাজ নয় এবং এটি সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কারের পরিপন্থী নয়। ফুকাহায়ে কেরামও এ কথা সুস্পষ্ট শব্দে জানিয়েছেন।

হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে লোকটির সম্পর্কে বলেছেন যে, 'দুনিয়া ও আখেরাতে এ লোক এই তিন স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই পাবে না' এ কথার সম্পর্ক ইখলাস না থাকার সঙ্গে। সম্মানী গ্রহণ করা-না করার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। উল্লেখিত হাদিসে লোকটির কর্মপন্থা ও বক্তব্যটা আরেকবার স্মরণ করুন। লোকটি বলেছিল, 'আল্লাহর কসম, তোমরা গনিমতের মাল পাবে, কি পাবে না, তা আমার নিশ্চিত জানা নেই। কাজেই আমার জন্যে একটি নির্ধারিত অংশ বরাদ্দ করে দাও।' লোকটির এ শর্তারোপ এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, জিহাদে অংশগ্রহণের পেছনে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, দুনিয়া অর্জন করা। লোকটি তার জিহাদের ক্ষেত্রে মুখলিস ছিল না। মুসলিস না হওয়ার কারণে, দুনিয়াপূজারী হওয়ার কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটি সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছে যে, দুনিয়া ও আখেরাতে সে এ ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

এ কথার স্বপক্ষে স্পষ্ট দলিল হলো, মুসলিম শরিফে হযরত আবু হুরায়রা রাদি. কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل أستشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قال : فما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت قال : كذبت ولكن قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر فسحب على و جهه حتى ألقي في النار. (مسلم : ٤٩٠٠)

হাদিসটির সারমর্ম হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে সর্বপ্রথম যে লোকটিকে উপস্থাপন করা হবে, সে হবে একজন শহিদ। তাকে হাজির করা হবে। তার কাছ থেকে হিসাব-কিতাব নেওয়া হবে। জবাবদিহি হবে। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ, তোমার দ্বীনের খাতিরে আমরা যুদ্ধ করেছি। রক্ত বইয়েছি। জীবন উৎসর্গ করেছি। শাহাদাত বরণ করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, 'সন্দেহ নেই, তুমি এ কাজগুলো করেছো; কিন্তু এ উদ্দেশ্যে করেছো যে, মানুষ তোমার শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের প্রশংসা করবে।' এ কথা বলে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

এ হাদিসে লোকদেখানো মুজাহিদকে যে জাহান্নামে ফেলার কথা এসেছে, তার বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে এ অভিযোগ ওঠবে না যে, তুমি কেন পারিশ্রমিক ও সম্মানী নিয়েছো? বরং তাকে পাকড়াও করা হবে এ অভিযোগে যে, তোমার জিহাদের মাঝে কেন ইখলাস ছিল না? কেন তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকিয়ে জিহাদ করলে না?

আর স্বতসিদ্ধ বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তির ইখলাস থাকা-না থাকার ব্যাপারে অন্য কোনো ব্যক্তির সিদ্ধান্ত জানানো খুবই কঠিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোল্লিখিত ঘটনায় জানতে পেরেছিলেন যে, লোকটি জিহাদের ক্ষেত্রে মোটেও মুখলিস ছিল না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, স্বর্ণমুদ্রা কামাই করা। এজন্যে তিনি কথাগুলো বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের কারো পক্ষে কোনো মানুষের ইখলাস থাকা-না থাকার ফয়সালা করা সম্ভব নয়। আর আমল কবুল হওয়া-না হওয়া, সাওয়াব পাওয়া-না পাওয়া পুরোপুরি নির্ভর করে ইখলাস থাকা-না থাকার ওপর। সম্মানী নেওয়া-না নেওয়ার ওপর মোটেও নির্ভর করে না। শরিয়তের এই মূলনীতির মাঝে শুধু মাদরাসায় পড়ানোর শিক্ষকতাই অন্তর্ভুক্ত নয়; দাওয়াত ও তাবলীগ, বাইআত ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রেও যদি ব্যক্তি মুখলিস না হয়, তাহলে সে সম্মানী নিলো, কি নিলো না, সেটা আল্লাহর কাছে বিবেচিত হবে না; ইখলাস না থাকার কারণে সে আল্লাহর বিচারে জাহান্নামের উপযুক্ত বিবেচিত হবে। শিক্ষক, দ্বীন প্রচারকারী, আমির, তাবলীগের সাধারণ সাথী— সবার ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য। কাজেই কোনো ব্যক্তি বা জামাতের ব্যাপারে কুধারণা লালন করা বা তাদের সম্পর্কে এমন তথ্য দেওয়া, যার কারণে অন্যদের মনে তাদের প্রতি কুধারণা জন্মাবে, এ কাজ কখনই জায়েয নয়। কেউ যদি এমন কাজ করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে অপর মুসলিম ভাই সম্পর্কে

কুধারণা সৃষ্টি করার গুনাহে লিপ্ত হবে। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো, নিজের ব্যাপারে চিন্তা করা ও নিজেই নিজের কাছ থেকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করা যে, আমি আমার শিক্ষকতা ও দাওয়াতের দায়িত্ব কতটুকু ইখলাসের সঙ্গে পালন করতে পেরেছি?

সারকথা হলো, হায়াতুস সাহাবার উপরোল্লিখিত ঘটনাকে এ কথার প্রমাণে দলিল হিসেবে পেশ করা যে, সম্মানী নিয়ে পড়ালে কখনই সাওয়াব পাওয়া যাবে না, এটা বিলকুল ভুল। কেউ যদি ওই ঘটনা থেকে এমন শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে সেটা নির্জলা অজ্ঞতা ও মূর্খতা হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এথেকে রক্ষা করুন। আমিন।

২.

আরেকটি বর্ণনা থেকে তাদের ভুল উপলব্ধি ও সেই সংশয়ের নিরসন

নিজ দাবি প্রমাণিত করার জন্যে মাওলানা সাদ সাহেব তার সেই বয়ানের মাঝে আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করে থাকেন। যেমনটি তিনি সদ্যসমাপ্ত আওরঙ্গাবাদ ইজতিমাতেও বয়ান করেছেন যে, এক সাহাবি জিহাদের প্রাক্কালে তীরসংগ্রহের ইচ্ছাও করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, 'ওই ব্যক্তি তীর ব্যতিরেকে দুনিয়া ও আখেরাতে অন্য কিছু পাবে না।' এ সম্পর্কে কয়েকটি নীতিকথা আপনাদের সমীপে মেলে ধরছি—

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও বিভিন্ন হাদিস গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করে জানা যায় যে, বুনিয়াদিভাবে মানুষের নিয়তও দু' প্রকার। একটি হলো, প্রধান নিয়ত। অপরটি হলো, প্রাসঙ্গিক নিয়ত। আসল নিয়তের ব্যাখ্যা হলো, এ কাজই আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যদি এই উদ্দেশ্য অর্জিত না হয় তাহলে এ কাজটি করা হবে না। যেমন, জিহাদের আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। যদিও জিহাদে বিজয় লাভ করলে মালে গনিমতও হস্তগত হয়; কিন্তু এটি হলো দ্বিতীয় স্তরের বস্তু। এখন যদি কেউ মালে গনিমত লাভের উদ্দেশ্যেই জিহাদ করে যে, যদি গনিমতের মাল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে জিহাদ করব, নয়তো জিহাদই করব না। তাহলে নিঃসন্দেহে তার এ নিয়ত ইখলাসের পরিপন্থী। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ তখনই হবে, যখন ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ময়দানে নামবে। কেউ যদি গনিমতের মাল পাওয়ার নিয়তে জিহাদ করে তাহলে সেটা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ হবে না। হাদিস শরিফে এসেছে—

أن رجلا أعرابيا أتى النبى فقال : يا رسول اللهﷺ الرجل يقاتل للمغنم و الرجل يقاتل ليذكر و الرجل يقاتل ليرى مكانه فمن فى سبيل الله؟ فقال رسول الله من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو فى سبيل الله. (مسلم شريف : ٤٨٩٦)

'এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এক ব্যক্তি গনিমতের লোভে জিহাদ করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বহুল আলোচিত হওয়ার বাসনায় জিহাদ করে। তৃতীয় ব্যক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে। এদের মধ্য হতে কে আল্লাহর রাস্তায়?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তির আল্লাহর পতাকা ও দ্বীন সর্বোতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে সে ব্যক্তিই আল্লাহর পথে।' (মুসলিম শরিফ, হাদিস নং : ৪৮৯৬)

এর বিপরীতে প্রাসঙ্গিক ও পরজীবি নিয়ত হলো, যেটি কর্মের পেছনে মূল উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের প্রাসঙ্গিক নিয়ত। এভাবে যে, যদি মূল উদ্দেশ্যের পাশাপাশি এটিকেও কোনোভাবে উদ্দেশ্য বানানো যায় তাহলে এর কারণে কাজের মাঝে অধিক স্পৃহা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, বা বেশি চাঞ্চল্য জন্মাবে।

এখন যদি কেউ এই স্তরে রেখে, অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা; কিন্তু এর পাশাপাশি দ্বিতীয় স্তরের নিয়ত হিসেবে আরো কিছু বিষয়কে সম্পৃক্ত করে, যেমন, মালে গনিমত, তীর-ধনুক, তরবারি-খঞ্জর, গোলাম-বাঁদি অর্জন করাকেও দ্বিতীয় স্তরের নিয়ত হিসেবে স্থান দেয়। আর আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করাকেই মূল উদ্দেশ্য বানায় তাহলে কখনই তার এই দ্বিতীয় স্তরের নিয়ত সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কার প্রাপ্তির পথে অন্তরায় হবে না। এটি তাকওয়া ও দ্বীনদারির পরিপন্থী বিবেচিত হবে না। সেমতে দেখা যায়, অনেকগুলো যুদ্ধে খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই জিহাদের ময়দানে, জিহাদের আগমুহূর্তে উচ্চ স্বরে ঘোষণা করেছেন—

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلبُهُ. (مسلم شريف)

> ‘কোনো মুসলিম সৈনিক যদি কোনো কাফেরকে হত্যা করে (তাহলে সে মালে গনিমত থেকে তো নিজ অংশ পাবেই। এর পাশাপাশি) ওই নিহত কাফেরের যেসব জিনিসপত্র, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি হস্তগত হবে, সেগুলোও ওই মুসলিম সৈনিককে প্রদান করা হবে।’

জিহাদের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এ ধরনের ঘোষণার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য। তা হলো, অধিক পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহের আবেগ যেন সৈনিকদের মাঝে অধিকতর চাঞ্চল্য ও হিম্মত সৃষ্টি করে। তাঁদের শক্তিমত্তার মাঝে যেন জোয়ার ওঠে। তাঁদের সাহসিকতার পারদ যেন উঁচু হয়। অথচ এর মাধ্যমে কিন্তু সম্পদ উপার্জনের মাধ্যমে আবেগদীপ্ত করা হচ্ছে; এবং কোনো না কোনো ভাবে এটাকে উদ্দেশ্যের অংশ বানানো হচ্ছে। নয়তো আপনিই বলুন, এর পেছনে আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে! এখন আপনিই বলুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই ঘোষণার ব্যাপারে কেউ কি এ কথা বলতে পারবে যে, প্রিয়নবিজি এর মাধ্যমে সম্পদ উপার্জনের লালসা ও দুনিয়ার জন্যে জিহাদ করার উৎসাহ দিয়েছেন, যা ইখলাসের পরিপন্থী? মাআযাল্লাহ, আদৌ এ কথা কেউ বলার দুঃসাহস দেখাবে না। সাহাবায়ে কেরাম রাদি. উঁচু মাপের ফকিহ ও বোদ্ধা ছিলেন। তাঁরা খুব ভালোভাবেই বুঝতেন যে, মূল নিয়ত আর প্রাসঙ্গিক ছায়া নিয়তের মাঝে ফারাকটা কোথায়? একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করাই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য; কিন্তু কেউ যদি সম্পদ উপার্জনকেও জিহাদের দ্বিতীয়, প্রাসঙ্গিক ও ছায়া উদ্দেশ্য বানায় তাহলে তা ইখলাসের পরিপন্থী হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই উক্ত ঘোষণা দিয়ে, জিহাদের দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্যের কোঠায় রেখে, সম্পদ উপার্জনের উদ্দীপনার মাধ্যমে জিহাদের ওপর উদ্বুদ্ধ করেছেন।

মোটকথা, আসল নিয়ত আর প্রাসঙ্গিক ছায়া নিয়তের মাঝে ফারাকের কথা তো খোদ শরিয়তের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। উভয়টিকে এক কাতারে রাখার সুযোগ নেই। এখন কেউ যদি সম্পদ উপার্জনকে মূল নিয়ত বানিয়ে জিহাদে যোগদান করে, বা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের তরবারি-যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তা ইখলাসের পরিপন্থী। এমন ব্যক্তি জাহান্নামের উপযুক্ত। সেই সম্পদও তার জন্যে জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করাকেই মূল উদ্দেশ্য বানাবে আর সম্পদ উপার্জনকে দ্বিতীয় স্তরের প্রাসঙ্গিক নিয়ত হিসেবে মেনে নেবে, তার এই কাজ কোনো অবস্থাতেই ইখলাস, সাওয়াব ও পরকালীন প্রতিদানের পরিপন্থী হবে না। খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকিয়ে এ ধরনের উৎসাহ দিয়েছেন, এটা প্রমাণিত বাস্তবতা।

এ কারণেই দেখা যায়, একটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের ঘোষণা দেন।

যুদ্ধের পর হযরত কতাদা রাদি. একটি তরবারির ওপর দাবী তোলেন। একবার দাবী তোলেন। আবারও দাবী তোলেন। একে একে তিনবার দাবী তোলেন। অবশেষে প্রমাণের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত কতাদার হাতে তরবারি তুলে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে এ কথা বলেননি যে, তুমি কেন বারবার এ ধরনের দাবী তোলছো? তুমি কি এই তরবারির জন্যেই জিহাদ করেছো? হাদিসের শব্দাবলি দেখুন—

جلس رسول الله ﷺ فقال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال : (أى قال قتادة) فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست... ثم قال ذلك الثالثة فقال رسول الله ﷺ مالك يا أبى قتادة الخ. (مسلم ٤٥٤٣)

আরেকটি হাদিস তুলে ধরছি। তায়েফ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের অবরোধ করেছিলেন। ওই যুদ্ধে তখন পর্যন্ত কোনো পরিণতি নিশ্চিত হয়নি। মুসলমান বাহিনীর হাতে মালে গনিমত আসেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মদিনায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সাহাবি তখন বলেন, 'এখন পর্যন্ত তো আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিনি। এভাবে খালি হাতেই ফিরে যাব!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবিদের আবেগের দিকে তাকিয়ে আরো কিছু দিন অবস্থান গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, তখন কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি যে, তোমরা কি জয়লাভ ও মালে গনিমতের জন্যেই যুদ্ধ করেছো?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসকল সাহাবির ক্ষেত্রে বুঝে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা মূলত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই জিহাদ করছে। আর এখন যে কথাগুলো বলছে, এগুলো তাদের দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য মাত্র। এজন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা কোনো ধরনের আপত্তি তোলেননি। হাদিসের ভাষায়—

> 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফবাসীকে অবরোধ করেন। তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু প্রাপ্তির আগেই তিনি ঘোষণা দেন, আল্লাহ চাহেন তো আমরা ফিরে যাব। তখন কয়েকজন সাহাবি নিবেদন করেন, 'আমরা কি তায়েফ বিজয় না করেই ফিরে যাব!' (মুসলিম শরিফ, বাবু গাযওয়াতিত তায়েফ, হাদিস : ৪৫৯৬, কিতাবুল জিহাদ, ফতহুল মুলহিম, পৃষ্ঠা : ১৩৫, খণ্ড : ৯)

<u>৩.</u>
একদল সাহাবি কর্তৃক আরেকদল সাহাবির ভুল বুঝাবুঝির নিরসন

তৃতীয় রেওয়ায়েত। একবার এক জিহাদে কিছু সাহাবি যুদ্ধের পূর্বে প্রতিপক্ষকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। সেই দাওয়াতে সাড়া দিয়ে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তখন আরেকদল সাহাবি এসে সেনাপতিকে বলে যে, 'আরে! আমাদেরকে লড়াই করার সুযোগ দিতেন। আমরা লড়তাম। কিছু গোলাম-বাঁদি হাতে আসত। মালে গনিমতও পেতাম। আপনি তো আমাদের সবাইকে বঞ্চিত করে দিলেন।'

বলুন, এ বর্ণনা থেকে কি এ সংশয় সৃষ্টি হয় যে, ওই সকল সাহাবি সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্যে জিহাদ করতে এসেছিলেন! তারা কি জিহাদের ক্ষেত্রে মুখলিস ছিলেন না?

এর উত্তর সেটাই, যা আমরা পূর্বে বলেছি যে, এ সংশয় ঠিক নয়। সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই মুখলিস ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করা। গোলাম-বাঁদি হস্তগত করা বা মালে গনিমত লাভ করা— এগুলো ছিল দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য। যা ইখলাস, সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কারের পরিপন্থী নয়। নয়তো সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এ কারণে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদটি জানার পরও তাঁদেরকে বিচারের কাঠগড়ায়

তোলেননি। কিছু কিছু অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রতিপক্ষকে ইসলামের দাওয়াত দেননি। বিনা দাওয়াতেই আক্রমণ করেছিলেন। কারণ, তাদের কাছে আগেই দাওয়াত পৌঁছানো হয়েছিল। যেমনটি মুসলিম শরিফের নিম্নের বর্ণনায় এসেছে—

عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسئله عن الدعاء قبل القتال؟ قال كتب الي انما كان ذلك فى أول الإسلام قد أغار رسول الله ﷺ على بنى المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء الخ. (الصحيح لمسلم، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام، حديث : ٤٤٩٦، كتاب الجهاد، فتح الملهم، صـ : ١٦، جـ٩)

উপরের বিশদ আলোচনা থেকে খুব ভালোভাবে বুঝে আসে যে, জিহাদ হোক বা দ্বীনের অন্য কোনো খিদমত হোক, যেমন, কুরআন শিক্ষা দেওয়া, হাদিস শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। সেগুলোতে যদি সম্মানীকে কেউ দ্বিতীয় স্তরের প্রাসঙ্গিক নিয়ত বানায় এবং দ্বীনের খিদমতের পাশাপাশি সম্মানীকেও ছায়া ও প্রাসঙ্গিক নিয়ত হিসেবে বানিয়ে নেয় তাহলে কখনই সেটা ইখলাস, সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কারের পরিপন্থী হবে না। একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। কেউ যদি পূর্ণ ইখলাসের সঙ্গে হজে যায় আর সেখানে সে দ্বিতীয় স্তরের প্রাসঙ্গিক নিয়ত হিসেবে এ ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে, আমি সেখান থেকে যমযমের পানি, খেজুর ও জায়নামায ইত্যাদি দেশে এনে বিক্রি করে কিছু ব্যবসা করব, তাহলে তার এ নিয়ত কখনই ইখলাস, সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। এর বিপরীতে কেউ যদি হজ্বে স্রেফ এ উদ্দেশ্যে যায় যে, আমি সেখানে গিয়ে ব্যবসা করব, চাঁদা করব, জিনিসপত্র ক্রয় করব ইত্যাদি। তাহলে সে ব্যক্তি কখনই মুখলিস নয়। সে কখনই হজ্বের পূর্ণ সাওয়াব পাবে না। কেননা সে এগুলোকেই তার মূল উদ্দেশ্য বানিয়েছিল। এখানে বিধানের ফারাক হয়েছে মূল নিয়ত ও ছায়া নিয়তের ক্ষেত্রে।

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. বিষয়টি স্পষ্টাকারে বুঝিয়েছেন। হযরতের লেখাটুকু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—

> ‘যদি মূল উদ্দেশ্য হজ্ব হয় আর ব্যবসা হয় তার অনুগামী। যার আলামত হলো, যদি তার কাছে ব্যবসার জিনিসপত্র না থাকত তবুও সে অবশ্যই হজ্বে যেত তাহলে এর অর্থ হলো, এখনো তার মাঝে ইখলাস বহাল আছে। কাজেই তার হজ্বের সাওয়াব হ্রাস পাবে না। এর বিপরীতে যদি ব্যবসাই মূল উদ্দেশ্য হয়, আর হজ্ব হয় অনুগত উদ্দেশ্য। তাহলে লোকটি গুনাহগার হবে। কারণ, সে মুখলিস নয়। লোকদেখানোর জন্যে হজ্ব করছে। কেননা সে সবাইকে বোঝাচ্ছে যে, আমি হজ্বে যাচ্ছি; অথচ সে মূলত ব্যবসা করতে যাচ্ছে।’
>
> ‘প্রশ্ন হলো, যদি কারো মূল উদ্দেশ্য হয় হজ্ব করা। আর ব্যবসা করাটা দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য হয়, এমতবস্থায় কোনটি উত্তম? ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে যাওয়া উত্তম, নাকি না নেওয়া উত্তম? এর উত্তর হলো, যদি তার কাছে পথের যাবতীয় পাথেয় ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণ থাকে তাহলে উত্তম হলো, ব্যবসায়িক পণ্য সঙ্গো না নেওয়া। কেননা এতে ইখলাস বেশি। আর যদি পথের পাথেয় প্রয়োজন পরিমাণে থাকে; কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে না থাকে আর ব্যবসার নিয়তটি হয় দ্বিতীয় স্তরের প্রাসঙ্গিক নিয়ত তাহলে সে এভাবে নিয়ত করবে যে, সফরের সুবিধার জন্যে আমি ব্যবসায়িক পণ্য সঙ্গো নিচ্ছি। এমতবস্থায় ব্যবসায়িক পণ্য সঙ্গো নেওয়াটাও সাওয়াবের কারণ হবে।’ [তাজদিদে মায়িশাত : ২০৪, মালফুজাতে কামালাতে আশরাফিয়্যাহ : ১০০]

হযরত থানভি রহ. আরেক জায়গায় লিখেছেন—

> ‘যদি কেউ এ উদ্দেশ্যে হজ্বে গমন করে যে, আমি সেখানে গিয়ে ব্যবসা করব তাহলে তা মাকরুহ ও নাজায়েয হবে। আর যদি কেউ হজ্বে গিয়ে তিজারত এ উদ্দেশ্যে করে যে, আমি এর

অর্থ দিয়ে পূর্ণ প্রশান্তির সঙ্গে হজ্ব আদায় করব তাহলে তা জায়েয হবে।' [ওয়াযে রুহ, সুন্নাতে ইবরাহিম পুস্তিকার সঙ্গে যুক্ত : ৪১৬]

উপরের আলোচনা সামনে রেখে এবার আপনি বুঝুন, যেই সাহাবিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ক্ষেত্রে তীর সংগ্রহের নিয়ত পোষণ করার কারণে সতর্ক করে বলেছেন যে, 'এ ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে এই তীর ছাড়া আর কিছুই পাবে না' তাকে তিনি এ সতর্কতা স্রেফ এ কারণেই করেছিলেন যে, সে তীর সংগ্রহ করাকেই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য বানিয়েছিল। নবিজিকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি তীর সংগ্রহ করাকেই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য বানিয়েছিল। এজন্যে নবিজি তাকে শক্ত কথা বলেছিলেন। কিন্তু কেউ যদি এ ঘটনা থেকে এ পরিণতি বের করে এবং নিঃশর্তে বলা শুরু করে যে, 'একটি তীরের নিয়তকারী সাহাবিকেও নবিজি সতর্ক করে বলেছিলেন যে, ওই লোক তীর ছাড়া আর কোনো বিনিময়ই পাবে না।' এরপর সেই ঘটনাকে দ্বীনি ইলম শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের ওপর প্রয়োগ করা শুরু করে তাহলে সেটা হবে বিশাল জ্ঞানগত বিচ্যুতি। এ ধরনের ভুল একমাত্র সে ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব, যে উপরিউক্ত শারঈ জ্ঞান এবং মূল নিয়ত ও প্রাসঙ্গিক নিয়তের মধ্যকার ফারাকের কথা মোটেও জানে না। এই অজ্ঞতার কারণেই সে এমন সব বয়ান সর্বত্র বলে বেড়াচ্ছে, যে বয়ানের কারণে উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনের খাদিমদের ওপর জনগণের মনে অপধারণা ও মন্দ অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। যা খুবই বিপদজনক কাজ। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ ধরনের অনিষ্ট কাজ থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

উবাই ইবনে কা'ব ও উবাদা ইবনে সমিত রাদি. এর বর্ণনার ভুল ব্যাখ্যা ও তার নিরসন

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব ও তার সমমনা তাবলীগি যিম্মাদাররা প্রায়শই এ কথা বলে থাকে যে,

> 'তোমরা ইলম বিক্রি করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের এ মেজায তৈরি করেছেন যে, ইলম বিক্রির পণ্য নয়। অর্থাৎ বিনা বেতনে পড়ানো উচিত।'

তারা এ বক্তব্য থেকেই এ শাখা বের করেছে যে, 'দ্বীনি ইলম শিক্ষাদানের পাশাপাশি জীবিকার জন্যে ব্যবসা করো। মাদরাসাকে আয়ের ঘর বানিয়ো না।' তারা তাদের এ বক্তব্যের দলিল হিসেবে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদি. এর ঘটনা বর্ণনা করে থাকেন যে, একবার এক ছাত্রকে তিনি কুরআন কারিম পড়িয়েছিলেন। তার পিতা তখন খুশি হয়ে তাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটি জাহান্নামের আগুনের টুকরো। বর্ণনাটি বিভিন্ন রূপে বর্ণিত রয়েছে। আমরা সবগুলো বর্ণনা আপনাদের সামনে মেলে ধরছি।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদি. থেকে বর্ণিত, একবার তিনি একব্যক্তিকে কুরআন কারিমের একটি সূরা শিক্ষা দেন। তখন লোকটি তাকে একটি কাপড় বা রেখাবিশিষ্ট সূতি চাদর উপহার পাঠান। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলে তিনি বলেন, যদি তুমি সেই উপহার গ্রহণ করো তাহলে তোমাকে আগুনের কাপড় পরানো হবে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদি. থেকে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিখিয়েছিলাম। সে আমাকে তখন একটি ধনুক উপহার দেয়। বর্ণনার বাকি অংশ আগের বর্ণনার অনুরূপ। [কানযুল উম্মাল : ১/২৪০। হায়াতুস সাহাবা : ৩/২৫৪]

হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদি. বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন পড়াতাম। সে তখন আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। কাঠের গুণগত মান আর বাঁকা হওয়া— উভয় বিচারে এরচে' উত্তম ধনুক

আমি আর দেখিনি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে নিবেদন করলাম যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই উপহার গ্রহণের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কী? উত্তরে তিনি বলেন, 'যদি তুমি সেই ধনুক ঝোলাও তাহলে এর অর্থ হবে, তুমি তোমার দু' বাহুর মাঝখানে একখণ্ড আগুন ঝোলালে। অন্য বর্ণনায়, তুমি এ উপহার গ্রহণ করলে তোমার গলায় আগুন ঝোলালে। [কানযুল উম্মাল : ১/২৩১। হায়াতুস সাহাবা : ৩/২৫৪]

হায়াতুস সাহাবার মাঝে এ জাতীয় আরো কিছু বর্ণনা নকল করা হয়েছে। এগুলোকে তাবলীগের সেই মহল নিজেদের ওই দাবীর পক্ষে সবচেয়ে বড় দলিলের ভাণ্ডার মনে করে থাকে। অর্থাৎ তারা যে বলে, মাদরাসায় পড়িয়ে সম্মানী নেওয়া সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কারের শুধু পরিপন্থীই নয়; বরং আযাবেরও কারণ বটে। এ জাতীয় বয়ান করে করে তারা তাদের অনুগতদের মানসিকতা এভাবে গঠন করে যে, দ্বীনের তালিম বিনা সম্মানীতেই হতে হবে। সম্মানী নিয়ে দ্বীনি ইলম শেখালে সেটা আর দ্বীনের খেদমত হবে না এবং সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কারের কারণও হবে না। তারা তাদের এ দাবির স্বপক্ষে এ ধরনের বর্ণনাগুলোকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকে। এ সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে কিছু নীতিকথা আপনাদের খেদমতে তুলে ধরছি—

১.

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, বিভিন্ন বর্ণনা ও হাদিস থেকে মাসআলা ইজতিহাদ করা, কিয়াস করা, উদ্ভাবন করা বা রিওয়ায়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করা— এগুলো মুজতাহিদ ইমাম ও আলেমদের কাজ। অযোগ্যরা যদি ইজতিহাদ শুরু করে বসে তাহলে এর পরিণতি কী হবে, তা আজ সবার চোখের সামনে স্পষ্ট। আলোচিত বর্ণনাগুলোর সবচেয়ে সঠিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশেদিনই বুঝেছেন। কাজেই সবার আগে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, খুলাফায়ে রাশেদিন সহ অপরাপর সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এ জাতীয় বর্ণনাগুলোর কী অর্থ বুঝেছেন? তারা এগুলো থেকে কী পরিণতি বের করেছেন? কারণ হলো, খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবি ও খলিফাদের দ্বীনি বোধ ও ধার্মিকতার ওপর আশ্বস্ত ছিলেন। তাঁদের ওপর আস্থা রাখতেন। এমনকি তিনি উম্মতকে তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশও দিয়েছেন। সেমতে ইরশাদ করেছেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ.

> 'তোমাদের অবধারিত দায়িত্ব হলো, তোমরা আমার সুন্নত ও আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নত অনুসরণ করবে।'

এর কারণ হলো, তাঁদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ জীবনাচার ও নির্দেশাবলি ভাস্বর ছিল। তাঁরা জানতেন, নবিজি কোন প্রেক্ষাপটে, কোন পরিস্থিতিতে কোন কথাটি বলেছেন। তাঁরা খুব ভালো ভাবেই জানতেন যে, কোন কথাটি তিনি কোন উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। কাজেই সাহাবায়ে কেরাম রাদি. সেই বর্ণনাগুলোর যে অর্থ বুঝবেন, সে অর্থই সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য বিবেচিত হবে। কেননা অনেক সময় একটি বিষয় সম্পর্কে বা একটি মাসআলার ব্যাপারে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম তখন একটি বর্ণনাকে বিশেষ পরিস্থিতির ওপর প্রয়োগ করতেন। আর অন্য বর্ণনাগুলোকে ভিন্ন পরিস্থিতির জন্যে নির্ধারিত করতেন।

আমাদের মুজতাহিদ ইমামগণ সাহাবায়ে কেরামের সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের আলোচিত বিষয়বস্তুর ওপর কিছু রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, যা হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদি. ও হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদি. থেকে বর্ণিত। তাঁদের বর্ণনার মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রাপ্ত উপহারকে জাহান্নামের অংশ বলেছেন। কিন্তু অন্য প্রেক্ষাপটে

দেখা যায় যে, তিনি কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রাপ্ত সম্মানীকে শুধু জায়েযই বলেননি; বরং তা গ্রহণ করার পরামর্শও দিয়েছেন। যেমন, মুসলিম শরিফের মাঝে একটি বড় হাদিসে এসেছে যে, এক সাহাবি জনৈক নারীকে বিয়ের ইচ্ছে করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি মোহরের অর্থ আছে? সাহাবির কাছে কিছুই ছিল না। নবিজি তখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কুরআন পড়তে পারো? তিনি নিবেদন করলেন, জি, পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, ঠিক আছে। ওই নারীকে তুমি কুরআন শিখিয়ে দেবে। এটাই তোমার জন্যে মোহর। অর্থাৎ যেভাবে সবাই বিয়ের সময় স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রাকে বিয়ের মোহর নির্ধারণ করে থাকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শিক্ষা দেওয়াকে ঠিক সেভাবেই বিনিময় ও সম্মানী নির্ধারণ করে দিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহর নির্ধারণ করেছিলেন, বিশটি আয়াত শিক্ষা দেওয়া। সবগুলো বর্ণনা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরছি–

فلما جاء قال : ماذا معك من القران؟ قال معى سورة كذا و سورة كذا فقال : تقروهن عن ظهر قلبك؟ الخ. (مسلم : ٣٤٧٢)

> **'যখন ওই সাহাবি এলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কুরআন কতটুকু পারো? বললেন, আমি অমুক অমুক সূরা পারি। নবিজি বললেন, তুমি সেগুলো মুখস্থ পড়ো।'** [মুসলিম শরিফ, হাদিস : ৩৪৭২, বাবুস সদাক]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

وفى حديث أبى هريرة فعلمها عشرين آية وهى إمرأتك. (فتح الملهم)

> **'হযরত আবু হুরায়রা রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, 'তুমি তাকে বিশ আয়াত শিখিয়ে দাও। সে তোমার স্ত্রী হয়ে যাবে।'** [ফাতহুল মুলহিম]

ফাতহুল মুলহিমের মাঝে আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. লিখেছেন—

> **'ইমাম ইবনে আবিদিন রহ. বলেন, ফতোয়া হলো, কুরআন ও ফিকাহ শিখিয়ে সম্মানী নেওয়া জায়েয। কাজেই এটাকে মোহর নামকরণ সঠিক। কেননা কেননা যেই উপকারের বিপরীতে বিনিময় নেওয়া জায়েয, সেটাকে মোহর নাম দেওয়াও জায়েয। বিষয়টি আমরা পূর্বেই বাদায়েউস সনায়ে' নামক গ্রন্থ থেকে নকল করেছি। এ কারণেই ফাতহুল কাদির গ্রন্থে এসেছে যে, ইমাম শাফেঈ রহ. যেহেতু কুরআন শিখিয়ে সম্মানী গ্রহণ করা জায়েয ফতোয়া দিয়েছেন, কাজেই এটাকে মোহর নামকরণ জায়েয। তাঁর মতো আমরাও বলব যে, ফতোয়া হলো, এটাকে মোহর নামকরণ সঠিক।'** [ফাতহুল মুলহিম : ৩/৪৮৩]

আরেক হাদিসে এসেছে যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পড়িয়ে সম্মানী নেওয়াকে অতিউত্তম বলেছেন। এ জাতীয় বেশ কিছু বর্ণনার কারণেই ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম শাফেঈ রহ. কুরআন পড়িয়ে সম্মানী নেওয়াকে শতভাগ জায়েয বলেছেন। এখানে তিল পরিমাণ কারাহাত বা আল্লাহর অপ্রিয়তা নেই। একই ধারাবাহিকতায় হানাফি মাযহাবের পরবর্তী প্রজন্মের সকল ফকিহ প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করে কারাহাতমুক্ত জায়েয ফতোয়া দিয়েছেন। উদ্ধৃতি দেখুন,

> **'ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, কুরআন শিখিয়ে সম্মানী নেওয়া জায়েয। কেননা এখানে জ্ঞাত কাজের জন্যে জ্ঞাত প্রদেয় অনুসারে সম্মানী দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ হলো, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবির বিয়ে পড়িয়েছেন, তাঁর মুখস্থকৃত কুরআন কারিমকে মোহর ধার্য করে। কাজেই কুরআনকে বিনিময় বানানো জায়েয। অপর হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যেসব কাজের জন্যে**

সম্মানী গ্রহণ করো, সেগুলোর মধ্য হতে পারিশ্রমিকের সর্বাধিক হকদার হলো, আল্লাহর কুরআন।' [আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৫/৩৮১৯]

'কানযের গ্রন্থকার বলেন, বর্তমান সময়ে ফতোয়া হলো, কুরআন কারিম পড়িয়ে সম্মানী নেওয়া জায়েয। এটাই পরবর্তী সময়ের বালখের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের মাযহাব।' [তাবঈনুল হাকায়িক : ৫/১২৪]

'সর্বসম্মতিক্রমে ভাষা, সাহিত্য, গণিত, হস্তলিপি, ফিকাহ, হাদিস ও এ জাতীয় অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সম্মানী গ্রহণ করা জায়েয।' [আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু : ৫/৩৮২০]

২.

আলোচিত মাসআলা সম্পর্কিত সমস্ত রেওয়ায়েত সামনে রেখে খুলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এ অর্থই বুঝেছেন যে, দ্বীন শিখিয়ে ও কুরআন পড়িয়ে সম্মানী নেওয়া সম্পূর্ণরূপে জায়েয। আল্লাহ কখনই একে অপসন্দ করেন না। এটি সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কারের পরিপন্থীও নয়। এমনকি এটি তাওয়াককুল ও খোদাভীরুতার পরিপন্থীও নয়। এ কারণেই সাইয়্যেদুনা উমর রাদি. তাঁর খেলাফতকালে নিজেই কুরআন কারিমের শিক্ষক, ফিকাহ শাস্ত্রের শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের জন্যে সম্মানী নির্ধারণ করেছেন। যার বিবরণ এ বইয়ের শুরুতে অতিক্রান্ত হয়েছে।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, যেই উবাই ইবনে কা'ব রাদি. ও উবাদা ইবনে সামিত রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে দ্বীন ও কুরআন শেখানোর বিনিময় বাবদ সম্মানী গ্রহণ করাকে জাহান্নামের আগুন গ্রহণ করার নামান্তর বলে সতর্ক করেছেন, সেই উবাই ইবনে কা'ব ও উবাদা ইবনে সমিত রাদি.— দু'জনকেই হযরত উমর ফারুক রাদি. তাঁর খেলাফতকালে কুরআন ও ফিকাহ শিক্ষাদানের কাজে সবেতনে নিয়োগপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামের জামাতে যুক্ত করেছিলেন। বিষয়টিকে আরেকটু খুলে বলছি। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদি. ও হযরত উবাদা ইবনে সমিত রাদি.— যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কুরআন ও দ্বীনি ইলম পড়িয়ে সম্মানী গ্রহণ সম্পর্কে কড়া সতর্ক বার্তা শুনেছিলেন এবং তাঁদের সম্পর্কে এ বিষয়টি হযরত উমর রাদি. খুব ভালোভাবেই জানতেন, কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও হযরত উমর রাদি. যখন তাঁর শাসনামলে কুরআন কারিম শিক্ষা ও ফিকাহ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে একদল ক্বারি ও ফকিহ সাহাবির নাম চূড়ান্ত করেন, তাঁদের তালিকায় সবার আগে রাখেন এই দু' মহান সাহাবির নাম। এই নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক সাহাবিদের জন্যে হযরত উমর রাদি. সুনির্দিষ্ট সম্মানী নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউ এর ওপর আপত্তি তোলেননি, বা সম্মানী গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাননি; বরং তাঁরা সানন্দ্যেই সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদি.ও অস্বীকৃতি জানাননি। যদিও তিনি অসুস্থতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে সেসময় কুরআন শিক্ষা দেওয়ার খিদমত আঞ্জাম দিতে পারেননি। আল্লামা শিবলি নুমানি রহ. তাঁর ঐতিহাসিক রচনা 'আল ফারুক'-এর মাঝে তাযকিরাতুল হুফফায ও উসদুল গবাহ গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে নকল করেছেন—

'সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর মধ্য হতে পাঁচজন মহান সাহাবি এমন ছিলেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। মুআয ইবনে জাবাল রাদি. উবাদা ইবনে সমিত রাদি. উবাই ইবনে কা'ব রাদি. আবু আইয়্যূব রাদি. ও আবু দারদা রাদি.।

এঁদের মধ্য হতে বিশেষ করে উবাই ইবনে কা'ব রাদি. ছিলেন সাইয়্যেদুল কুররা বা শ্রেষ্ঠ ক্বারি। হযরত উমর রাদি. তাঁদের সবাইকে ডেকে বলেন, শামের মুসলমানদের জন্যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কাজেই আপনারা সেখানে গিয়ে তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিন। আবু আইয়্যূব

রাদি. এ সময় দুর্বল ও উবাই ইবনে কা'ব রাদি. অসুস্থ ছিলেন। এজন্যে তাঁরা দু'জন যেতে পারেননি। অবশিষ্ট তিনজন সানন্দ্যে নির্দেশ মেনে নেন।

তবাকাতুল হুফফায গ্রন্থে আবদুর রহমান ইবনে গনম রাদি. এর জীবনবৃত্তান্তে এসেছে যে, হযরত উমর রাদি. তাঁকে ফিকাহ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে শামদেশে পাঠিয়েছিলেন। হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদি. এর জীবনবৃত্তান্তে এসেছে যে, যখন শাম বিজিত হয় তখন হযরত উমর রাদি. তাঁকে ও মুআয ইবনে জাবাল রাদি. ও আবু দারদা রাদি.কে শামে পাঠান এ দায়িত্ব দিয়ে যে, তাঁরা সেখানকার জনগণকে কুরআন পড়াবেন ও ফিকাহ শিক্ষা দেবেন।

ইবনে জাওযি রহ. এ কথা পরিষ্কার শব্দে লিখেছেন যে, হযরত উমর রাদি. সেই ফকিহদের জন্যে সম্মানীও নির্ধারণ করেছিলেন। আর বাস্তবতা হলো, সম্মানী ব্যতিরেকে কখনই শিক্ষাদানের সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠতে পারে না। [উসদুল গবাহ ও তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থদ্বয়ের উদ্ধৃতিতে আল ফারুক, পাকিস্তান সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২৪৮-২৫০]

হযরত উমর রাদি.সহ অপরাপর সাহাবায়ে কেরাম রাদি.এর কর্মপন্থা আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, তাঁরা কখনই কুরআন পড়িয়ে সম্মানী গ্রহণ করাকে শরিয়তপরিপন্থী বা তাকওয়া পরিপন্থী কিংবা সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কারের পরিপন্থী মনে করতেন না। তাঁরা 'তীর ও ধনুক' এর বিবরণ সম্বলিত বর্ণনাগুলো থেকে কখনই এ ধরনের পরিণতি বের করে আনেননি। তাঁরা কখনই সেসব হাদিসের এ অর্থ বোঝেননি যে, কুরআন পড়িয়ে সম্মানী বা হাদিয়া নেওয়া একবাক্যে ভুল। যদি তাই হতো তাহলে হযরত উমর রাদি. কখনই এ ধরনের রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নিতেন না। যদি তাই হতো, তাহলে যেবসব সাহাবির সঙ্গে আলোচিত সতর্কবার্তা ও হুশিয়ারি ঘটেছিল, তাঁরা কখনই হযরত উমর রাদি. এর সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন না; বরং পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানিয়ে দিতেন। আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবায়ে কেরাম কখনই সত্য কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি।

৩.

প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সেসব বর্ণনা ও সেসব বাক্যের কী অর্থ, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং এ উদ্দেশ্যে গৃহীত বস্তুকে জাহান্নামের আগুনের টুকরো মন্তব্য করেছেন? এ সব বর্ণনার ব্যাখ্যা কী? এ বর্ণনাগুলো কোথায় প্রযোজ্য হবে?

মহান আল্লাহ আমাদের সকল মুজতাহিদ ইমাম ও আমাদের আকাবির ফুকাহা ও উলামায়ে কেরামকে উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁরা এমনভাবে সকল বিধান সুস্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিটি হাদিসের প্রয়োগস্থল আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের সামনে স্পষ্ট। কোথাও কোনো ধরনের বিপত্তি ও ধোঁয়াশা নেই।

আমাদের আকাবির ফুকাহা ও উলামা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দ্বীন শিখিয়ে, কুরআন পড়িয়ে, ইমামতি ও বয়ানের দায়িত্ব পালন করে সম্মানী নেওয়া সম্পূর্ণরূপে জায়েয। এতে লেশমাত্র অপ্রিয়তা বা অনিষ্টতা নেই। এটাই চূড়ান্ত ফতোয়া। হ্যাঁ, তার জন্যে অবশ্যই কাজের পরিমাণ ও সম্মানী উভয়টি নির্ধারিত হতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সময় পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে যে, আপনাকে প্রতিদিন এত ঘণ্টা কুরআন পড়াতে হবে। তার জন্যে আপনার এত টাকা সম্মানী হবে। খতিব নিযুক্ত করার সময় জানাতে হবে যে, আপনাকে প্রতিদিন বা অমুক দিন এ পরিমাণ সময় বয়ান করতে হবে। আপনার এ পরিমাণ সম্মানী হবে। ইমামতি ও আযান দেওয়ার জন্যে নিয়োগ দেওয়ার সময়ও অনুরূপ আলোচনা কাম্য। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ সহ পরবর্তী সময়ের সকল উলামায়ে আহনাফের

মতে, উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো ষোলোআনা জায়েয। উদ্ধৃতির প্রয়োজনে ফতোয়ায়ে শামি সহ অপরাপর ফতোয়াগ্রন্থগুলো দেখুন।

আরেক সুরত হলো, পূর্ব থেকে কোনো কথাবার্তা হয়নি, চাকরিতে নিয়োগদানের আলোচনা হয়নি, কাজ ও সম্মানী নির্ধারণ হয়নি। যেমন কোনো ভালো ক্বারি এসে তাৎক্ষণিকভাবে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়িয়ে দিলেন। অথবা কোনো বক্তা বা খতিব ওয়ায করলেন। বা কোনো ক্বারি এসে কুরআন কারিমের কোনো অংশ পড়ালেন। যেহেতু তাঁদের এই খেদমত কোনো সুনির্দিষ্ট লেনদেন বা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হয়নি, কাজেই এর জন্যে সম্মানী দেওয়া ও নেওয়া— দুটোই নাজায়েয। আমাদের আকাবির ফুকাহা বিষয়টি তাঁদের গ্রন্থাবলিতে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন। হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. তাঁর *ইমদাদুল ফতোয়া* গ্রন্থে লিখেছেন,

> **প্রশ্ন** : ইমামতি ও ওয়ায করে সম্মানী নেওয়া জায়েয কি, জায়েয নয়?
>
> **উত্তর** : নেক কাজ করে সম্মানী নেওয়া যে নাজায়েয, তার থেকে ইমামতির মাসআলা আলাদা। কিছু লোক ওয়ায করাকেও আলাদা করেছেন। আবার কেউ নাজায়েয বলেছেন। এ দু' মতের মাঝে সমন্বয় হলো, যদি ইমামতির মতো ওয়ায করাকেও কেউ চাকরি হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে তার জন্যে সম্মানী নেওয়া জায়েয। কিন্তু যদি এমন চাকরি না হয় আর কেউ তাৎক্ষণিক সম্মানীর দাবী করে বসে তাহলে জায়েয নয়। যেমন, কেউ যদি কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়িয়েই সম্মানী চায় তাহলে সেটা নাজায়েয হবে। [ইমদাদুল ফতোয়া : ৩/৩৯০, কিতাবুল ইজারাহ, প্রশ্ন : ৩৬৮]

হযরতুল আকদাস মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ. তাঁর ফতোয়াগ্রন্থে লিখেছেন,

> 'শরিয়তে কোনো অমুজতাহিদের ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। যদি ওয়াজের ওপরও সম্মানী ধার্য করা হয় তাহলে নিয়োগের শর্ত, সময়, সম্মানী ইত্যাদি নির্ধারিত করে নিতে হবে। যেমন, জানিয়ে দেবে যে, প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে ওয়ায করতে হবে এবং এ পরিমাণ সম্মানী পাবে।'
>
> যেমনিভাবে শিক্ষাদানের চাকরি জায়েয, তদ্রূপ ওয়ায ও বয়ানের চাকরিও জায়েয। কাজ নির্ধারিত করে নিতে হবে। যেমন, প্রতিদিন এক ঘণ্টা বা প্রতি জুমুআর জন্যে দু' ঘণ্টা ওয়ায করতে হবে। আর তার জন্যে এ পরিমাণ অর্থ সম্মানী দেওয়া হবে। অথবা বক্তাকে শুধু বয়ান করার স্বতন্ত্র দায়িত্ব দিয়েই নিয়োগ দেওয়া হবে যে, দাওয়াত দেওয়া হোক বা না দেওয়া হোক, আপনি মাহফিলে গিয়ে, বা অন্য স্থানগুলোতে গিয়ে গিয়ে বয়ান করবেন।' [ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, পৃষ্ঠা : ২২৩-২২৬, খণ্ড : ২৫, প্রশ্ন : ৯২১৭ ও ৯২২০, যাকারিয়া বুকডিপো, দেওবন্দ কর্তৃক প্রকাশিত]

আকাবির উলামা ও ফকিহগণের উপরিউক্ত স্পষ্ট বিবরণ সামনে রাখলে বুঝে আসে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদি. ও উবাদা ইবনে সমিত রাদি.— যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শেখানোর বিনিময়ে হিসেবে ধনুক ও কাপড় গ্রহণ করার কারণে সতর্ক করে জাহান্নামের আগুনের ভীতি দেখিয়েছিলেন, তাঁদের সেই ঘটনার সম্পর্ক উপরে আলোচিত দ্বিতীয় সুরতের সঙ্গে। অর্থাৎ, যেখানে চাকুরিতে নিয়োগদানের মতো ঘটনা ঘটেনি ও নির্দিষ্ট সময় প্রদান করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। স্রেফ আল্লাহর জন্যে স্বেচ্ছায় কুরআন শিক্ষা দান করতেন। সুযোগ পেলে পড়াতেন। শিক্ষকের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বাধা ছিল না। যার ফলে কোনো সম্মানীও নির্ধারিত ছিল না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, ধনুক বা কাপড় হিসেবে যা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো যদিও হাদিয়া নামে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু কোনোভাবেই সেটি যেন পারিশ্রমিক না হয়। কারণ, এ ধরনের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নয়।

এর বিপরীতে হযরত উমরে ফারুক রাদি. কুরআন কারিমের শিক্ষক ও ফিকাহ শাস্ত্রের প্রশিক্ষকদের জন্যে

যেই সম্মানীকাঠামো নির্ধারণ করেছিলেন, তা উপরের সুরত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ, সেখানে রীতিমত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না করা হতো। কাজের ধরণ ও পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্ধারিত ছিল। এ কারণেই হযরত উমর রাদি. ও অপরাপর সাহাবায়ে কেরাম এটাকে জায়েয অভিহিত করেছিলেন।

এখন আপনিই বলুন, বর্তমান সময়ে যেসকল ইমাম ও মুয়াজ্জিন দায়িত্ব পালন করে থাকেন; বা যেসকল শিক্ষক দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাদের সাদৃশ্য কাদের সঙ্গে? তাদের জন্যে কর্মের ধরণ ও সময়ের সীমারেখা নির্ধারিত আছে, কি নেই? শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি কি 'ইজারা' সাব্যস্ত হয় কি, হয় না? আপনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, এটি অবশ্যই ইসলামি শরিয়তের সেই 'ইজারা', যেখানে কাজের পাশাপাশি সম্মানীও নির্ধারিত। কাজেই তা নিঃসন্দেহে জায়েয। কিন্তু এর বিপরীতে কেউ যদি অল্প সময়ের জন্যে, বা তাৎক্ষণিকভাবে, পূর্বে কোনো সম্মানী ও কাজের ধরণ নির্ধারণ না করেই কাউকে কিছু শিখিয়ে দেয়, তাহলে এর জন্যে সম্মানী দেওয়া ও নেওয়ার কোনোটাই জায়েয হবে না। এ দুটি সুরতের মাঝে কী পার্থক্য, তা আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে স্বচ্ছ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদি. ও হযরত উবাদা ইবনে সমিত রাদি.-এর যে ঘটনায় সতর্ক করে হুশিয়ার করেছিলেন, তার সম্পর্ক হলো, যেখানে পূর্ব থেকে সম্মানী ও কাজের পরিধি নির্ধারিত নয়। আর হযরত উমর রাদি. এর কর্মপন্থার সম্পর্ক হলো সেই সুরতের সঙ্গে, যেখানে পারিশ্রমিক ও কাজের ক্ষেত্র পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। কাজেই উভয়টির প্রয়োগস্থল আলাদা।

পুরো বিষয়টি এখান থেকে ভালো ভাবে বুঝে নিন। এবার আপনিই বলুন, কেউ যদি হযরত উবাদা ইবনে সমিত রাদি. ও উবাই ইবনে কা'ব রাদি. এর উপরিউক্ত বর্ণনাদুটিকে এ কথার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে যে, 'কুরআন শিক্ষা দিতে হবে সম্মানী ব্যতিরেকে। ইলম বিক্রয়ের পণ্য নয়। আজর ও উজরত বা সাওয়াব ও সম্মানী এক জায়গায় একত্র হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানী নেওয়াকে জাহান্নামের আগুন অভিহিত করেছেন' তাহলে তার সেই দলিলবাজিকে আপনি কীকরে সঠিক বলবেন? যেকোনো সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ উপরিউক্ত বিশদ বিবরণ জানার পর নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, মাওলানা সাদ সাহেব ও তার সমমনাদের এ ধরনের বয়ান কতটা সঠিক?

ব্যভিচারী লোকেরা কি সম্মানীগ্রহণকারী আলেমদের আগে জান্নাতে যাবে?
হায়াতুস সাহাবার একটি বর্ণনার ইলমি নিরীক্ষণ

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব ও তার সমমনা কিছু তাবলীগি সাথী দ্বীনি মাদারিসের শিক্ষকদেরকে বিনাসম্মানীতে পড়াতে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। তারা জীবিকা নির্বাহের জন্যে ব্যবসার সোৎসাহ পরামর্শ দেন। এসকল হযরত যদি খুলাফায়ে রাশেদিন, বিশেষত সাইয়্যেদুনা উমর রাদি. এর কর্মপন্থা, ফুকাহায়ে কেরামের স্পষ্ট নির্দেশনা এবং দেওবন্দ ও সাহারানপুরের আকাবির উলামায়ে কেরামের সবসময়ের কর্মপন্থা ভালোভাবে লক্ষ্য করতেন তাহলে তারা নিজেরাই এ কথা বুঝতে সক্ষম হতেন যে, এত অজস্র শক্তিশালী দলিলের বিপরীতে 'হায়াতুস সাহাবা' গ্রন্থে নকলকৃত উমর রাদি. এর নামে প্রচারকৃত একটি মন্তব্য আদৌ কি দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে!

যারা কুরআন ও দ্বীনি ইলম শেখাতেন, সেই শিক্ষকদেরকে উমর রাদি. সম্মানী নেওয়ার জন্যে কী পরিমাণ জোরাজুরি করতেন, তার বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। এবার তার সঙ্গে হযরত উমর রাদি. এর নামে প্রসিদ্ধ ও প্রচারিত এ কথাটিকে মেলান,

يَا اَهْلَ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ لاَ تَأْخُذُوْا لِلْعِلْمِ وَالْقُرْآن ثَمَنًا فَتَسْبِقكُمُ الزُّنَاةُ اِلى اْلْجَنَّةِ (حياة الصحابة : ٣\٣٣٣)

'হে দ্বীনি ইলম ও কুরআনের বাহকগণ, তোমরা দ্বীনি ইলম ও কুরআনের বিনিময় নিয়ো না। যদি নাও তাহলে ব্যাভিচারকারীরা তোমাদের আগে জান্নাতে যাবে।' [হায়াতুস সাহাবা : ৩/৩৩৩]

মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত উমর ইবনুল খত্তাব রাদি. বলেন, হে উলামায়ে কেরাম ও কুরআনের বাহকগণ, তোমরা ইলম ও কুরআন বাবদ কোনো মূল্য নিয়ো না। যদি এমনটি করো তাহলে ব্যভিচারীরা তোমাদের আগে জান্নাতে যাবে। (হাকিম : ৩/৪৫০, হায়াতুস সাহাবা : ৩/২৫৫)

বর্ণনাটিকে হযরত উমর রাদি. এর মন্তব্য নামে প্রচার করা হয়। এ সম্পর্কে আমরা আপনাদের খেদমতে কয়েকটি কথা নিবেদন করব,

১.

কখনই বিবেক এ কথায় সায় দেবে না যে, একদিকে হযরত উমর রাদি. পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে ফকিহ সাহাবি, শিক্ষক সাহাবি, ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের জন্যে সম্মানী নির্ধারণ করবেন। সম্মানী নিতে বাধ্য করবেন। অন্যদিকে 'আপনাদের আগে ব্যভিচারীরা জান্নাতে যাবে' মন্তব্য করে তাদের অপমানিত ও ছোট করবেন। তিনি ভালো করেই জানেন যে, উলামায়ে কেরাম হলেন নবিদের ওয়ারিস। إن العلماء ورثة الأنبياء। কীভাবে তিনি সেই নবির ওয়ারিসদের ওপর ব্যভিচারীদেরকে এত বেশি প্রাধান্য দিয়ে বসবেন যে, সেই উলামায়ে কেরামের আগে ব্যভিচারীদেরকে জান্নাতে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করবেন। হযরত উমর রাদি. এর মতো ব্যক্তির সঙ্গে এ ধরনের বৈপরীত্বপূর্ণ অবস্থান ও বক্তব্য কখনই বিবেক সায় দেয় না।

২.

ব্যভিচারীরা উলামায়ে কেরামের আগে জান্নাতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা ব্যভিচারী যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকাবস্থায় নিজ গুনাহ থেকে তাওবা না করবে অথবা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে না দেবেন অথবা জাহান্নামে গিয়ে তারা তাদের অপরাধের শাস্তি ভোগ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা জান্নাতে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা খোদ কুরআন কারিম থেকে এ কথা স্পষ্টাকারে প্রমাণিত যে, জান্নাতে

সেসকল লোকই প্রবেশ করবে, যারা ব্যভিচার করে না। যারা ব্যভিচার করবে তারা জাহান্নামে যাবে। কারণ, জান্নাতিদের বৈশিষ্ট্যের তালিকায় এ কথায় রয়েছে যে, তারা ব্যভিচার করে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (سورة الفرقان : ٦٨)

> **'এবং আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।।'** [সূরা ফুরকান : ৬৮]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, হায়াতুস সাহাবার যেই বর্ণনা মাওলানা সাদ সাহেব ও তার সমমনারা বলে বেড়াচ্ছেন, সেটা তো কুরআন কারিমের পরিষ্কার প্রত্যাদেশের পরিপন্থী। শুধু কুরআন কারিমই নয়; অনেকগুলো হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যভিচারীদের জন্যে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা পর্যন্ত বলেছেন যে,

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (رواه البخارى ومسلم. حديث ابى هريرة. كتاب الكبائر للذهبى : ٥٠)

> **'ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন তার ঈমানই বাকি থাকে না।'** [বুখারি ও মুসলিম, হযরত আবু হুরায়রা রাদি. কর্তৃক বর্ণিত, কিতাবুল কাবায়ের লিয যাহাভি : ৫০]

অপর হাদিসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, কিছু মানুষকে জ্বলন্ত চুলোর উত্তপ্ত আগুনের মাঝে জ্বলতে দেখছে। তখন তিনি হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করেন,

فقلت من هولاء يا جيرئيل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني. (رواه البخارى. كتاب الكبائر للذهبى : ٥١)

> **'হে জিবরিল, এরা কারা? উত্তরে তিনি বলেন, এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী নারী।'** [বুখারি শরিফ, কিতাবুল কাবায়ের লিয যাহাভি : ৫১]

কাজেই এ কথা বলা ভুল যে, ব্যভিচারীরা ওই সকল আলেম ও ক্বারির আগে জান্নাতে যাবে, যারা সম্মানী নিয়ে শিক্ষাদান করেন। তারা কীভাবে উলামায়ে কেরামের আগে জান্নাতে যাবে, তারা তো ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতেই পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের কৃত অপরাধের শাস্তি জাহান্নামে ভোগ না করবে, বা আল্লাহ তাদেরকে মাফ না করে দেবেন, বা কোনো আলেম ও হাফেয তাদের জন্যে জান্নাতের সুপারিশ না করবে। যেমনটি হাদিস শরিফে এসেছে যে, এক হাফেযের সুপারিশে আল্লাহ তাআলা এমন দশজন পাপীকে জান্নাত দান করবেন, যাদের জন্যে জাহান্নামের ফয়সালা চূড়ান্ত হয়েছিল। তদ্রূপ আলেমের সুপারিশে এমন অসংখ্য লোক জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে, যাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছিল। [তাফসিরে মাযহারি, সূরা বনি ইসরাঈল। ইবনে মাজাহ। বাইহাকি। দায়লামি ইবনে উমর রাদি. এর সূত্রে। মাআরিফুল কুরআন, পারা : ১৫, পৃষ্ঠা : ৫০৭, খণ্ড : ৫]

বুঝা গেল, ব্যভিচারী ব্যক্তি যদি কোনো হাফেয বা কোনো আলেম বা কোনো শহিদের সুপারিশ পায় অথবা আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া লাভ করে তাহলে তারাও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। নয়তো কুরআন কারিমের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যভিচারীদের জন্যে জাহান্নাম অবধারিত।

৩.

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এ বর্ণনার সনদ সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য। এ বিষয়ে আমি নিজ থেকে নতুন করে কোনো অনুসন্ধানে না গিয়ে মাযাহিরে উলুম সাহারানপুরের সম্মানিত মুফতি শুয়ায়ব আহমদ বাসতাভি সাহেবের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ তুলে ধরা যথেষ্ট মনে করছি। প্রবন্ধটি রচনার পেছনে একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। তাহলো, কিছু দিন পূর্ব মাওলানা সাদ সাহেব মাযাহিরে উলূমে এসে

একটি বিশেষ মজলিসে বয়ান করেন। সেই বয়ানে তিনি নিজের সেই পুরনো ঢঙে সেই বিতর্কিত ও অগ্রহণযোগ্য বয়ান পেশ করেন এবং দলিল হিসেবে এ বর্ণনা তুলে ধরেন। তখন মুফতি শুয়ায়ব আহমদ সাহেবসহ মাযাহিরের অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরাম মাওলানা সালমান সাহেব (মহাব্যবস্থাপক. মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর) এর কাছে মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেন। তারা এ আলোচনার শক্ত ভাষায় সমালোচনা করেন। সেই ঘটনার সূত্র ধরে মুফতি সাহেব সাদ সাহেবের কথা খণ্ডন করে এ নিবন্ধ রচনা করেন। নিবন্ধটি মাওলানা সালমান সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত মাসিক ম্যাগাজিনে আলোর মুখ দেখে। মাওলানা সালমান সাহেবের সমর্থন ও সত্যায়নের পরই প্রবন্ধটি সেই মাসিক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা সেই প্রবন্ধ থেকে সনদ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অংশটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এ প্রবন্ধ পড়লে আপনাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আদতে এ বর্ণনা কতটুকু শুদ্ধ? এবং সনদের বিচারেও কেন বিলকুল অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য?

তাজ্জব লাগে, কী কারণে মাওলানা সাদ সাহেবের তরফদারি করে প্রকাশিত এই বইয়ে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের বিরুদ্ধে গিয়ে পুরনো সেই বর্ণনাটিকেই আবার নকল করা হলো! এমনটি কেন করা হলো? আসুন, এবার আমরা মুফতি শুয়ায়ব আহমদ সাহেবের প্রবন্ধটি পড়ি।[৪]

সাহারানপুরের মুফতি শুয়াইব বাসতাভি সাহেবের প্রবন্ধ

মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের মুফতি ও উসতায মাওলানা মুফতি শুয়ায়ব বাসতাভি সাহেব তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন,

> ‘বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় দুঃখজনক বিষয় হলো, সবক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি আর ছাড়াছাড়ি চলছে। আলোচিত মাসআলাতেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। একবার এক ব্যক্তি (উদ্দেশ্য, মাওলানা সাদ কান্ধলভি সাহেব) একটি বিশেষ বয়ানের মজলিসে বলেন,
>
> ‘দ্বীনি ইলমের পাঠদান হতে হবে ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ সম্মানী না নিয়ে হতে হবে। যদি কেউ দ্বীন শিখিয়ে সম্মানী নেয় তাহলে এ সম্পর্কে হযরত উমর রাদি. বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়িয়ে সম্মানী নিল, তার পূর্বেই ব্যভিচারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে।’
>
> ফি সাবিলিল্লাহ দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া খুবই ভালো ও ঈর্ষণীয় কাজ। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না; কিন্তু যেই জিনিসকে সকল ফকিহ ও জমহুর উলামায়ে কেরাম জায়েয অভিহিত করেছেন, সেই সম্মানীকে এতোটাই নিকৃষ্ট বলা যে, তা যিনা থেকেও নিকৃষ্টতর, এটা আমাদের মতো সেই বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িওয়ালা পথ। এ কারণে আমি হযরত উমর রাদি. এর নামে প্রচারিত বর্ণনাটির সত্যাসত্য অনুসন্ধানের কাজ শুরু করি যে, বাস্তবেই এই বর্ণনা হযরত উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, কি বর্ণিত নয়? যদি বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে এর সূত্র কোথায়? আমাদের হাতের কাছে যতগুলো কিতাব রয়েছে, সেগুলো পড়তে শুরু করি। যেমন, مسند عمر بن الخطاب ؓ، موسوعة آثار الصحابة (মুসনাদে উমর ইবনুল খত্তাব রাদি. মওসুআয়ে আসারুস সাহাবা) ইত্যকার গ্রন্থে আমরা সেই বর্ণনা পাইনি। এরপর আমরা হায়াতুস সাহাবা দেখি। হায়াতুস সাহাবার উরদু সংস্করণের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণনাটি এভাবে আছে,

[৪]. আল্লাহ তাআলা মুফতি শুয়াইব সাহেবকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি বর্ণনা সম্পর্কে মুহাদ্দিসিনে কেরামের তাহকিক তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশের আল কাউসার পত্রিকার সেপ্টেম্বর ২০১৮ সংখ্যায় মাওলানা রাইয়ান বিন লুৎফুর রহমানের কলমে আরো অধিকতর তাহকিক হয়েছে। আমরা পাঠকদের সুবিধার্থে সেই প্রবন্ধটি বইয়ের শেষাংশে যুক্ত করে দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ, সেই প্রবন্ধ পড়ে আমরা প্রচলিত এই বর্ণনার সমৃদ্ধ তাহকিক জানতে পারব। –আ. আ. ফারুক

‘হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, হযরত উমর ইবনুল খত্তাব রাদি. বলেন, হে উলামায়ে কেরাম, আপনারা ইলম ও কুরআনের জন্যে মূল্য নেবেন না। নয়তো ব্যভিচারী লোক আপনাদের আগেই জান্নাতে চলে যাবেন। (হায়াতুস সাহাবা : ৩/২৬৫)

যিনি হায়াতুস সাহাবা গ্রন্থের টীকা যোগ করেছেন, তিনি এ বর্ণনার নিচে লিখেছেন,

ذكر الخطيب في الجامع كذا في كنز العمال، صـ ٢٢٩، جـ١

তখন কানযুল উম্মাল খুলে দেখতে পাই, সেখানে বর্ণনাটি এভাবে বর্ণিত রয়েছে,

‘লায়স মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেন, উমর রাদি. বলেন, হে ইলম ও কুরআনের বাহকগণ, তোমরা ইলমের জন্যে মূল্য গ্রহণ কোরো না তাহলে নিম্নশ্রেণির লোকজন তোমাদের আগে জান্নাতে চলে যাবে।’ [আল জামে : ১/৫১৬, হাদিস নং : ৮৮৭]

আল জামে‘–এর এই বর্ণনার সঙ্গে কানযুল উম্মালের বর্ণনার বেশ বড় ফারাক রয়েছে। এখানে এসেছে ‘الدناة’ শব্দ। যার মূল উৎস হচ্ছে دنى। অর্থ হলো, নিচু স্তরের মন্দ লোক। আর কানযুল উম্মালের বর্ণনায় এসেছে, الزناة শব্দ। যা زانى এর বহুবচন। অর্থ হলো, জিনাকারী লোক। দু’ শব্দের মাঝে কী পরিমাণ পার্থক্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পার্থক্য বিলকুল স্পষ্ট।

বুঝা গেল, খতিবের আল জামে‘ গ্রন্থে الزناة এর স্থলে الدناة রয়েছে। যার অর্থ নিম্নমানের মন্দ লোক। দ্বিতীয় কথা হলো, الزناةওয়ালা বর্ণনা তো অনেক পরের কথা, খোদ الدناةওয়ালা বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রহণযোগ্য না হওয়ার চারটি কারণ রয়েছে,

১.

খতিবের আল জামে’ গ্রন্থের বর্ণনার সনদে معلى بن هلال (মুআল্লা ইবনে হিলাল) নামে এক ব্যক্তি রয়েছেন। তার ব্যাপারে হাফেয ইবনে হজর আসকালানি রহ. তাঁর تقريب التهذيب (তাকরিবুত তাহযিব) গ্রন্থে লিখেছেন,

معلّى بن هلال بن سويد ابو عبد الله الطحان الكوفي اتفق النقاد على تكذيبه

মুআল্লার ব্যাপারে সকল আইম্মাতুল জরহি ওয়ান নকদ একমত যে, লোকটি মিথ্যুক। (তাকরিবুত তাহযিব : ৫৪১)

২.

এ বর্ণনার আরেকজন রাভি হচ্ছেন, جبارة بن المغلس (জাব্বারা ইবনুল মুগাল্লাস)। তার ব্যাপারে তাকরিবুত তাহযিব গ্রন্থে এসেছে যে, هو ضعيف—লোকটি দুর্বল। (তাকরিবুত তাহযিব : ১৩৭)

৩.

মুজাহিদ নকল করেছেন যে, লোকটি مجهول বা অজ্ঞাত। তিনি কোন লায়স থেকে বর্ণনা করেন, তা সুস্পষ্ট নয়। সাধারণত যিনি মুজাহিদ থেকে নকল করেন তার নাম ليث بن أبي سُليم بن زنيم (লায়স ইবনে আবি সুলাইম ইবনে যুনাইম)। যাকে ইমাম মুসলিম রহ. সহিহ মুসলিমের ভূমিকায় দ্বিতীয় স্তরের রাভি সাব্যস্ত করেছেন। হাফেয ইবনে হজর রহ. *তাকরিবুত তাহযিব* গ্রন্থে তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, লোকটি যদিও صدوق (সত্যবাদী) বটে; কিন্তু তার বর্ণনাগুলো পরিত্যাজ্য। কারণ, শেষ বয়সে তিনি স্মৃতিবিভ্রাটের শিকার হয়ে বর্ণনা গুলিয়ে ফেলতেন। আর তার স্মৃতিবিভ্রাটের পূর্ববর্তী সময়কার বর্ণনাগুলো স্মৃতিবিভ্রাটের পরবর্তী সময়কার বর্ণনাগুলো

থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়নি।

৪.

হযরত মুজাহিদ রহ. সরাসরি হযরত উমর রাদি. থেকে নকল করেছেন। অথচ মুজাহিদ রহ. এর জন্ম ২১ হিজরিতে আর হযরত উমর রাদি. এর জন্ম ২৩ হিজরিতে। অর্থাৎ হযরত উমর রাদি. এর ইনতিকালের সময় মুজাহিদ রহ. ২ বছরের শিশু ছিলেন। এ কথা স্পষ্ট যে, দু' বছরের শিশু হাদিস বর্ণনা করতে পারে না। যার অর্থ হলো, সনদের মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী কাটা পড়েছে। যা উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই এ বর্ণনাও منقطع (মুনকতে')।

(মাসিক মাযাহিরে উলূম, সেপ্টেম্বর ২০০৪ সংখ্যা। প্রবন্ধ লেখক, মুফতি শুয়ায়ব আহমদ বাসতাভি)

৫.

এতক্ষণ আমরা বর্ণনার সনদ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন যদি বর্ণনার ভাষ্য পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাব, হযরত উমর রাদি. এর এই বর্ণনা খোদ তাঁর আজীবনের কর্মপন্থার পরিপন্থী। কাজেই অগ্রহণযোগ্য।

আলোচনা চলমান রাখার তাগিদে যদি বর্ণনাটিকে কিছুক্ষণের জন্যে শুদ্ধ মেনে নিই তাহলে অবশ্যই বর্ণনাটির অবশ্যই এমন ব্যাখ্যা বুঝতে হবে, যা শরিয়তের মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। হ্যাঁ, শর্ত হলো, বর্ণনার ভাষ্যের মাঝে সেই ব্যাখ্যা ফুটিয়ে তোলার সুযোগ থাকতে হবে। কুরআন শিক্ষা দিয়ে, কুরআনি বিদ্যা পড়িয়ে সম্মানী-বিনিময় নেওয়া ইসলামি শরিয়ত অনুসারে বিলকুল জায়েয, যেমনটি আমরা ইতিহাসের পাতায় হযরত উমর রাদি.-কে সম্মানী দিতে দেখেছি। হ্যাঁ, কুরআন তিলাওয়াত করে সম্মানী নেওয়া নাজায়েয। যেমন, কেউ যদি কাউকে বলে, আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও। আর সে বলে, আমি কুরআন পড়ে শোনাতে এ পরিমাণ অর্থ নেব। তাহলে কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে বিনিময় দেওয়া ও নেওয়া উভয়টিই নাজায়েয।

হযরত উমর রাদি. এর আলোচিত বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, প্রথমত এটি ইলমে হাদিসের গবেষকদের গবেষণা অনুসারে বিশুদ্ধতার মাণদণ্ডে উন্নীত হতে পারেনি। যার ফলে সেটি অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য।

যদি আমরা তর্কের খাতিরে সেটিকে শুদ্ধ বলে মেনেও নিই তাহলে অবশ্যই এর এমন ব্যাখ্যা বের করতে হবে, যা শরিয়তের মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। বর্ণনার এমন কোনো ব্যাখ্যা বের করা যাবে না, যা শরিয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। নয়তো হযরত উমর রাদি. এর কাজের সঙ্গে কথার বৈপরীত্ব মনে হবে।

৬.

সর্বশেষ কথা হলো, যদি আমরা এটিকে কোনো মতে বিশুদ্ধও ধরে নিই তখন লক্ষ্যণীয় হলো, এ বর্ণনাকে এমনভাবে সাধারণ মানুষের সামনে বলে বেড়ানো উচিত নয়, যার ফলে সাধারণ মানুষের মনে উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনের খাদেমদের প্রতি অশ্রদ্ধা, কুধারণা জন্মাবে। এটি খুবই গর্হিত কাজ। এটি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে বেয়াদবি ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের মতো নিকৃষ্টতম কাজ। এ ধরনের বয়ানের মাধ্যমে আলেমদের সঙ্গে বেয়াদবি ও শ্রদ্ধার দুয়ার খুলে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এ ধরনের বর্ণনা বয়ানের মাঝে বলে বেড়ানো ও এর থেকে ভুল পরিণতি বের করা কিছুতেই সঠিক নয়।

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের সকল উসতায, বিশেষত হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সালমান সাহেব (নাযিম, মাযাহিরে উলূম সাহারানপুর) এর শুকরিয়া আদায় করছি, তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে 'মুহাহানাত ফিদ দ্বীন' তথা দ্বীনের ক্ষেত্রে চাটুকারিতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে, দ্ব্যর্থহীন চিত্তে সত্য প্রকাশ করার সৎসাহস দেখিয়েছেন। তারা আপন ও পর- সবার সমালোচনা ও নিন্দার

ভয় না করে, নিজেদের মাসিক মুখপাত্র 'মাহনামা মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের' সেপ্টেম্বর ২০০৪ ঈ. সংখ্যায় মুফতি শুয়ায়ব আহমাদ বাসতাভির সেই প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, যা মাওলানা সাদ সাহেবের বিভ্রান্তিকর বয়ানের অপনোদনে লেখা হয়েছিল।

আমরা মনে করি, মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের আসাতিযায়ে কেরাম ও সম্মানিত নাযিম সাহেব নির্দ্বিধায়, অকপটে সত্য বলার যেই সৎসাহসিকতা দেখিয়েছেন, প্রয়োজনের সময় অকুণ্ঠে সত্য প্রকাশের সেই সাহসিকতা অন্যান্য উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসা সংশ্লিষ্ট মহলের দেখানো প্রয়োজন। কেননা মাওলানা সাদ সাহেব ও তাঁর সমমনা কিছু লোক যেসব বিভ্রান্তিকর গুমরাহ বয়ান দিয়ে বেড়ান, তার সংখ্যা দু'-চার বা দশ-বিশটি নয়; এমন বিভ্রান্তিকর বয়ানের সংখ্যা অজস্র। দিনদিন আপত্তিকর বয়ানের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মাওলানা সাদ সাহেব নিজস্ব ইজতিহাদের জোয়ারে এমন সব কথা বলে বেড়াচ্ছেন, যার ওপর উলামায়ে কেরাম ও মুফতিগণের তীব্র আপত্তি রয়েছে। তার এ জাতীয় কথা উম্মতকে ভুল বার্তা দিচ্ছে। যেমন,

১. তিনি জিহাদের সমস্ত ফযিলত দাওয়াত ও খুরুজ ফি সাবিলিল্লাহর উপরেই প্রয়োগ করছেন। তার ভাষায়, যুদ্ধ একটি সাময়িক বিষয়। সেই সাময়িক বিষয়ের ওপর এগুলোকে প্রয়োগ করা আর মূল কাজ দাওয়াতের ওপর প্রয়োগ না করা ভুল।

২. তিনি বলেন, 'আল্লাহর সাহায্য ইবাদতের সঙ্গে নয়: আল্লাহর সাহায্য দাওয়াতের সঙ্গে।

৩. তিনি বলছেন, 'মসজিদ নির্মাণ করা, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, বিধবা ও দরিদ্রদের সহায়তা করা ইত্যাদি দ্বীনের সাহায্য নয়। এ কাজগুলো তো কাফেররাও করে। দ্বীনের সাহায্য হলো, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ও আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া।

৪. তিনি فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة এর মনগড়া তাফসির করে উম্মতের প্রতিটি সদস্যের ওপর خروج (খুরুজ) ও نفر (নাফার) তথা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার আহ্বানে সাড়া দেওয়া জরুরি বলেন।

৫. তিনি وابتغوا من فضل الله আয়াতের প্রত্যাখ্যানযোগ্য ব্যাখ্যা করেন।

৬. লজ্জা ও নির্লজ্জতার ভুল বিশ্লেষণ করে বেড়ান। ইত্যাদি।

এক-দুটো নয়; এমন অজস্র ভুল ও বিভ্রান্তিকর কথা মাওলানা সাদ সাহেব তার বয়ানে বলে বেড়ান এবং সেগুলোর ওপর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে উম্মতের কাছে ভুল বার্তা ছড়াচ্ছেন। কাজেই উম্মতের সকল তথ্যানুসন্ধিৎসু উলামায়ে কেরাম, সমাজসংস্কারক ও মাদরাসা সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ হলো, ভুল ইজতিহাদ ও মনগড়া উদ্ভাবনের এই দুয়ার অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। যেকোনো মূল্যে দ্বীন, শরিয়ত, জমহুরের মতাদর্শ ও পুরো উম্মতের হিফাযত করতে হবে। মাওলানা সাদ সাহেব যেই ভুল কথাগুলো বলেছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে সেই পথ অবলম্বন করতে হবে, যা মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের সম্মানিত ব্যবস্থাপক হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সালমান সাহেবসহ অপরাপর আসাতিযায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দিন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সিরাতে মুসতাকিম তথা দ্বীনের চিরন্তন সরল পথের ওপর দৃঢ়তার সঙ্গে অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন।

উপসংহার

১.

দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিয়ে সম্মানী গ্রহণ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব যে কথাগুলো বয়ান করেন, তার সেই কথাগুলোর সঙ্গে আরো কিছু ডাল-পালা যুক্ত করে তার কিছু অনুগত তাবলীগি যিম্মাদার এ জাতীয় আরো কিছু মন্তব্য করে থাকে। যেমন,

(الف) تعلیم قرآن و تعلیم دین اور تدریس پر اجرت نہیں لینا چاہئے، اور اس لین دین کو اجرت زانیہ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور دلیل میں حضرت عمرؓ کا یہ اثر پیش کرتے ہیں کہ بہت سے زناکار اجرت لے کر تعلیم وتدریس کرنے والوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

(ب) اور مثلاً یہ کہ دینی تعلیم میں اجر واجرت دونوں جمع نہیں ہو سکتے یا تو اجر لے لو یا اجرت۔

(ج) اجرت لے کر تعلیم دینے والے کوئی دینی خدمت نہیں کر رہے، اصل دینی خدمت تو دعوت وخروج اور نفر ہے، جو بغیر کسی تنخواہ کے ہوتی ہے۔

(د) علمائے کرام کو اپنے اندر جامعیت پیدا کرنا چاہئے وہ یہ کہ تعلیم وتدریس اور دعوت کے ساتھ تجارت بھی کریں، جیسا کہ صحابہ کرام کرتے تھے، اپنے اندر جامعیت نہ پیدا کرنا یعنی تجارت نہ کرنا نکما پن ہے۔

(ہ) اور اپنے مذکورہ دعودں اور غلط باتوں کو ثابت کرنے کے لئے حضرت ابی ابن کعبؓ وغیرہ کی حدیثیں بیان کرنا وغیرہ وغیرہ۔

ক. কুরআন পড়িয়ে, দ্বীনি ইলম শিখিয়ে, মাদরাসায় শিক্ষকতা করে সম্মানী নেওয়া উচিত নয়। তারা এই আর্থিক লেনদেনকে ব্যভিচারী নারীর পারিশ্রমিকের সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকে। দলিল হিসেবে তারা হযরত উমর রাদি. এর সেই বর্ণনা পেশ করে যে, অনেক ব্যভিচারী সম্মানী নিয়ে শিক্ষকতাকারীদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

খ. তারা এ কথাও বলে থাকে যে, দ্বীনি তা'লীমের ক্ষেত্রে সাওয়াব ও বিনিময় একত্র হতে পারে না। হয়তো সম্মানী নেবেন, নয় সাওয়াব নেবেন।

গ. যে লোক সম্মানী নিয়ে পড়াচ্ছে, সে আদতে দ্বীনের কোনো খেদমত করছে না। দ্বীনের প্রকৃত খেদমত হলো, দাওয়াত, খুরুজ ও নাফার, যা বিনা বেতনে হয়ে থাকে।

ঘ. উলামায়ে কেরামের কর্তব্য হলো, তারা নিজ ব্যক্তিসত্ত্বার মাঝে জামিয়িয়্যাত তথা সামগ্রিক পূর্ণতা সৃষ্টি করবে। তার পদ্ধতি হলো, তারা মাদরাসায় অধ্যাপনা ও দাওয়াতের পাশাপাশি ব্যবসাও করবে। যেমনটি সাহাবায়ে কেরাম করতেন। নিজের ভেতরে সামগ্রিক পূর্ণতা সৃষ্টি না করা অর্থাৎ তেজারত না করাটা নিকম্মাপন অর্থাৎ অকর্মণ্য।

ঙ. তারা তাদের উল্লিখিত দাবি ও বিভ্রান্তিকর কথাগুলো প্রমাণিত করার জন্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদি.সহ প্রমুখের বর্ণনাগুলো উপস্থাপন করে থাকে।

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব ও তার অনুগত তাবলীগিদের এ জাতীয় দাবি, বয়ান ও দলিল সঠিক নয়। বিষয়টির ওপর আমরা এতোক্ষণ বিস্তারিত গবেষণা পেশ করেছি। এ জাতীয় বয়ানগুলোর কারণে আমাদের মহান আকাবির মনীষা ও বুযুর্গানে দ্বীনসহ বর্তমান সময়ের সকল শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসা সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি কুধারণা, বেয়াদবি ও অবমূল্যায়ন সৃষ্টি হচ্ছে। খোদ তাদের মাঝে

অহঙ্কার, ঔদ্ধত্ব, আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘা সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই এ জাতীয় বয়ান ও ভুল দলিল বয়ান করার অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।

২.

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে মজবুত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে যে কথাগুলো আমরা তুলে ধরেছি, তার আলোকে আমরা এ কথা পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে বলছি যে, সম্মানী সহকারে মাদরাসায় পড়ানো ও দ্বীন শিক্ষা দেওয়াও অনেক বড় দ্বীনি খেদমত। এটা কখনই সাওয়াব ও পরকালীন পুরস্কারের পরিপন্থী নয়। এটি কখনই তাকওয়া ও দ্বীনদারিতার পরিপন্থী নয়। মাদরাসায় পড়ানোর পাশাপাশি ব্যবসা না করাকে অকর্মণ্য ঠাওরানো খুবই নিন্দনীয় বক্তব্য। যদি এ কথাকে শুদ্ধ মেনে নেওয়া হয় তাহলে আমাদের সকল আকাবির মনীষাকে অকর্মণ্য মনে করতে হবে!

৩.

আমরা মাওলানা সাদ কান্ধলভি সাহেবের এ কথার ওপর আন্তরিক শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি ভুপালের ইজতিমায় লাখো মানুষের উপস্থিতিতে এবং এর বাইরে দেশে-বিদেশে, নিযামুদ্দিনের চৌহদ্দিতে, কাকরাইল মারকাজ সহ নানা স্থানে, মৌখিক ও লিখিত উভয় পদ্ধতিতে, ছোট-বড় সবাইকে সম্বোধন করে অসংখ্যবার নিজের মতাদর্শের কথা ঘোষণা করে বলেছেন,

"ہمارا کوئی مذہب یا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، دیوبند اور اہل دیوبند، ان کا مسلک ہی ہمارا مسلک ہے، دیوبند اور اہل دیوبند کا مسلک ہی ہمارا مسلک ہے، ذرہ برابر دین و دنیا کے کسی شعبہ میں اپنی رائے قائم کرنا اس کوئی تصور نہ کیا گیا ہے نہ کیا جاسکتا ہے"

'আমাদের কোনো পৃথক ধর্ম বা ভিন্ন কোনো পন্ধতি নেই। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। দেওবন্দ ও উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শই আমাদের মতাদর্শ। দেওবন্দ ও দেওবন্দি আলেমগণের মত ও পথই আমাদের মত ও পথ। দ্বীন ও দুনিয়ার কোনো শাখায় নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা পূর্বেও ছিল না, সম্ভবও নয়।'

মাওলানা সাদ সাহেব তার কিছু রুজুনামার মাঝে স্পষ্টভাবে লিখে জানিয়েছেন যে,

"احقر بغیر کسی تردد وتامل کے صاف لفظوں میں اپنا موقف واضح کرنا ضروری سمجتا ہے کہ احقر الحمد للہ اپنے تمام اکابر ومشائخ علماء دیوبند ومظاہر علوم سہارنپور کے موقف، اور اپنی جماعت کے اکابر حضرت مولانا محمد یوسف اور حضرت مولانا انعام الحسن کے مسلک ومشرب پر قائم ہے، اور اس سے ایک ذرہ انحراف کو بھی پسند نہیں کرتا، بندہ کو علماء دار العلوم دیوبند پر مکمل اعتماد ہے" (رجوع نامہ کی سب سے پہلی تحریر اور آخری تحریر، ماخوذ از سعادت نامہ، ص: ۱۱و۲۵)

আমি কোনো দ্বিধা–সংকোচ ও সংশয় ছাড়া পরিষ্কার ভাষায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি যে, আমি অধম আলহামদুলিল্লাহ, আমার দেওবন্দ ও মাযাহিরে উলুম সাহারানপুরে সকল আকাবির ও বুযুর্গানে দ্বীনের অবস্থান, আমাদের তাবলীগ জামাতের আকাবির মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব ও মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেবের আদর্শের উপরেই আছি। তাদের পদাঙ্ক থেকে এক বিন্দু পরিমাণও সরে যাওয়া আমার পছন্দ নয়। উলামায়ে দারুল উলুম দেওবন্দের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। (রুজুনামার সর্বপ্রথম লেখা ও শেষ লেখা, সাআদতনামা থেকে সংকলিত : ১১, ২৫)

তিনি আরো একটি জায়গায় বলেন,

"ہم کوئی مستقل جماعت نہیں اور ہمارا کوئی الگ مسلک نہیں، ہمارا کوئی علحدہ منشور نہیں، ہمارا مسلک ومشرب وہی ہے جو علماء دیوبند

وسہارنپور کا ہے، درس تفسیر وغیرہ کے متعلق بس یہ دیکھ لو کہ وہ مسلک دیوبند سے منسلک اور وابستہ ہے یا نہیں"

علمائے دیوبند کو جو مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے، تبلیغ کام کرنے والوں کا اپنی کوئی رائے قائم کرنا انتہائی گمراہی اور فتنہ کا سبب ہے، ئی بات دل سے نکال دینا کہ ہمارا ان مراکز کے علاوہ کوئی اور مرجع ہے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

بندہ محمد سعد بنگلہ والی مسجد نظام الدین

۲۹\صفر المظفر ۱۴۳۸ھ مطابق ۳۰\جنوری ۲۰۱۶ء بروز چہار شنبہ

(ماخوز از سعادت نامہ ص: ۱۳)

'আমরা আলাদা স্বতন্ত্র কোনো জামাত নই। আমাদের কোনো ভিন্ন মতাদর্শ নেই। আমাদের আলাদা কোনো ঘোষণাপত্র নেই। দেওবন্দ ও সাহারানপুরের উলামায়ে কেরামের মতাদর্শই আমাদের মতাদর্শ। কুরআন কারিমের ব্যাখ্যা পাঠের সময় শুধু এতটুকু দেখে নিন যে, সেটি দেওবন্দি মতাদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কি–না?'

দেওবন্দি আলেমগণের মতাদর্শই আমাদের মতাদর্শ। তাবলীগের সাথীদের নিজস্ব কোনো মত দাঁড় করানো মারাত্মক গুমরাহি ও ফেতনার কারণ। এই দ্বীনি মারকাযগুলোর বাইরে আমাদের অন্য কোনো উৎস আছে, এমন সংশয়ের বিন্দু পরিমাণ সুযোগও নেই।"

বান্দা মুহাম্মদ সাদ

বাংলাওয়ালি মসজিদ, নিযামুদ্দিন

২৯ সফর ১৪৩৮ হি.। ৩০ জানুয়ারি ২০১৬

(সাআদাতনামার ১৩ নং পৃষ্ঠা থেকে তথ্যগুলো সংগৃহীত)

৪.

দুঃখের বিষয় হলো, এতসব সরল স্বীকারোক্তি ও স্পষ্ট ঘোষণার পরও মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানকৃত এসব ভুল মাসআলা ও দলিলবাজির কারণে সকল মুহাক্কিক আলেম এবং দাওয়াত ও তাবলীগের সমঝদার সাথীরা ভীষণ চিন্তিত। তারা উদ্বিগ্ন এ বিষয়ে যে, লাখো লাখো মানুষের উপস্থিতিতে মাওলানার এ সকল স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা কি মিথ্যা ছিল? এগুলো কি স্রেফ মানুষকে দেখানোর জন্যে, শোনানোর জন্যে প্রতারণার ফাঁদ হিসেবে বলা হয়েছিল? বাস্তবতার সঙ্গে কি এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই?

যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে কেন মাওলানা সাদ সাহেব পুনরায় দেওবন্দ ও সাহারানপুরের আকাবির মনীষা ও জমহুর আহলে সুন্নাতের স্পষ্ট অবস্থান ও সুচিন্তিত গবেষণার বিরুদ্ধে গিয়ে, তাঁদের জারিকৃত ফতোয়ার বিপরীত অবস্থানে গিয়ে কুরআন ও হাদিসের মনগড়া-স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ভুল ফলাফল বের করছেন। অথচ ইজতিহাদ ও মাসআলা উদ্ভাবন করা তার দায়িত্ব নয়। তিনি কেন মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রাবে' হাসানি নদভি সাহেবের এই নির্দেশনা মেনে চলেন না যে,

"اگر کسی مسئلہ اور حدیث کی تحقیق و تشریح میں علمائے محققین سے ہٹ کر ان کی ذاتی رائے ہے تو اپنی ذات تک ہی اس کو محدود رکھیں، اس کو بیان نہ کریں"

'যদি কোনো মাসয়ালা ও হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যার বিপরীতে আপনার নিজস্ব অভিমত থাকে তাহলে সেটা শুধু নিজের ব্যক্তিসত্তার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখবেন; কোথাও বয়ান করবেন না।'

দেওবন্দ ও সাহারানপুরের সকল শীর্ষস্থানীয় আকাবির মনীষী ও এতদাঞ্চলের নির্ভরযোগ্য দারুল ইফতার সুচিন্তিত ও গবেষণালব্ধ ফতোয়ার বিপরীতে মাওলানা সাদ সাহেব যেসব কথা বয়ান করে থাকেন

সেগুলোকে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম উম্মতের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করে থাকেন। মাওলানা সাদ সাহেবের আবশ্যক দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, তিনি তার পূর্বের সরল স্বীকারোক্তি, স্পষ্ট ঘোষণা ও অঙ্গীকার অনুসারে অদ্যাবধি যেসব গলত বয়ান দিয়ে এসেছেন, সেগুলো থেকে স্বচ্ছভাবে রুজু করবেন, বয়ান প্রত্যাহার করবেন এবং আগামীতে এ জাতীয় গলত বয়ান পরিপূর্ণরূপে বর্জন করবেন। নিত্যনতুন ইজতিহাদ ও উদ্ভাবনের এই দুয়ার ভবিষ্যতেও বন্ধ রাখবেন।

মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম ও উম্মাহর শুদ্ধিকামী বুযুর্গানে দ্বীনের পক্ষে কখনই দ্বীনের ভুল ব্যাখ্যা, শরিয়তের অন্যায্য প্রতিনিধিত্ব, হাদিসের মনগড়া বিশ্লেষণ, মাসআলার ভুল বিবরণ ও নিত্য নতুন মনগড়া ইজতিহাদ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা দ্বীন ও শরিয়তের হিফাজত, উম্মতের হিফাজত এবং যেকোনো ধরনের বক্রতা ও বিভ্রান্তি থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা নিজেদের অবধারিত, অনিবার্য ও অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব-কর্তব্য মনে করে থাকেন।

মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাজুল হাদিস ওয়াল ফিকহ,
দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত
শাউয়াল ১৪৩৮ হিজরি

একটি প্রচলিত বর্ণনা
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

রাইয়ান বিন লুৎফুর রহমান

[**মাসিক আল কাউসার**।
বর্ষ : ১৪। সংখ্যা : ০৮।
যিলহজ্ব ১৪৩৯। সেপ্টেম্বর ২০১৮]

প্রশ্ন :

হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী রাহ. লিখিত 'হায়াতুস সাহাবা' কিতাবে উল্লেখিত হযরত উমর রাদি.-এর উক্তি হিসেবে বর্ণিত নিম্নোক্ত আছারটি সনদগতভাবে কি সঠিক? অর্থাৎ আসলেই কি হযরত উমর রাযি. এমন কিছু বলেছেন?

হে ইলম ও কুরআনের বাহকগণ, তোমরা ইলম ও কুরআনের মূল্য গ্রহণ করো না। অন্যথায় যেনাকারীরা তোমাদের পূর্বে জান্নাতে চলে যাবে।'

এ আছারটি কি সনদগত বিচারে বর্ণনাযোগ্য? যদি না হয়ে থাকে তবে কয়েকজন মুহাদ্দিস তাদের কিতাবে এই বর্ণনা কেন আনলেন? ইলম শিক্ষাদানের জন্য বিনিময় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতিমালা কী?

আহনাফ বিন আলী আহমদ
মিরপুর ১২, ঢাকা

উত্তর :

হযরত উমর রা.-এর নামে উদ্ধৃত এই আছারটিকে 'হায়াতুস সাহাবাহ' কিতাবে 'কানয'-এর সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। 'কানয' কিতাবে কোনো রেওয়ায়েতের সনদ উল্লেখ করা হয় না। তবে সেখানে প্রত্যেক রেওয়ায়েতের সঙ্গে উৎসগ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়, যে উৎসগ্রন্থে উক্ত রেওয়ায়েতটির সনদ বিদ্যমান। তো 'কানয'-এ এই রেওয়ায়েতের সঙ্গে খতীবে বাগদাদী রাহ.-এর কিতাব 'আলজামি লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামী'-এর বরাত রয়েছে। হায়াতুস সাহাবাহ খণ্ড : ৩ পৃষ্ঠা : ৩৩৩ -এ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী রাহ. প্রশ্নে উল্লেখিত আছারটির সঙ্গে খতীব রাহ.-এর এই কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। আর উলামায়ে কেরাম জানেন যে, খতীব রাহ.-এর এই কিতাবে তাঁর অন্যান্য কিতাবের মতোই নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের রেওয়ায়েত আছে। এমনকি তাতে অসংখ্য মওযু ও ভিত্তিহীন বর্ণনাও রয়েছে। তাই সনদ তাহকীক করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

যাইহোক, হযরত ইউসুফ কান্ধলভী রাহ. যেহেতু রেওয়ায়েতটি 'কানয'-এর সূত্রে খতীবে বাগদাদী রাহ.-এর কিতাব 'আলজামি লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামী'-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন তাই রেওয়ায়েতটির সনদ ও মতন আমরা সেই কিতাব থেকেই দেখে নিই। নিচে খতীবে বাগদাদী রাহ. এর কিতাব থেকে সনদ ও মতন তুলে ধরা হল—

أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيّ، نا أَبُو بَكْرٍ يَزِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ الْخَلَّالُ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عِيسَى التَّرْقُفِيّ، نا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، نا **الْمُعَلّى بْنُ هِلَالٍ الْأَحْمَرُ**، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا أَهْلَ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ، لَا تَأْخُذُوا لِلْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ ثَمَنًا، فَيَسْبِقَكُمُ الدّنَاةُ إِلَى الْجَنّةِ.

খতীবে বাগদাদী রাহ. আলী ইবনে ইবরাহীম আল বাসরী থেকে, তিনি আবু বকর ইয়াযীদ আলখাল্লাল থেকে, তিনি আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী ঈসা আততারকুফী থেকে, তিনি জুবারা ইবনে মুগাল্লিস থেকে, তিনি **মু'আল্লা ইবনে হেলাল** থেকে, তিনি লাইছ (ইবনে আবী সুলাইম) থেকে, তিনি মুজাহিদ রাহ. থেকে, তিনি হযরত উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন—

يَا أَهْلَ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ، لَا تَأْخُذُوا لِلْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ ثَمَنًا، فَيَسْبِقَكُمُ الدّنَاةُ إِلَى الْجَنّةِ.

হে ইলম ও কুরআনের বাহকগণ! তোমরা ইলম ও কুরআনের মূল্য গ্রহণ করো না। অন্যথায় 'দুনাত' তথা নিকৃষ্ট লোকেরা তোমাদের আগে জান্নাতে চলে যাবে। -আলজামি লি আখলাকীর রাবী ওয়া আদাবিস সামি ১/৩৫৬

হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী রাহ.-এর নিকট খতীবে বাগদাদীর এই কিতাব ছিল না। তাই তিনি 'কানয'-এর নুসখাকারী বা মুদ্রণকারীর ভুল সম্পর্কে জানতে পারেননি। ফলে (الدُّناة) 'দুনাত'-এর স্থলে (الزناة) 'যুনাত' লিখে দিয়েছেন। এবং একই কারণে তিনি এর সনদও দেখার সুযোগ পাননি। যদি তিনি এর সনদ দেখতেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলতেন যে, এটি এক কাযযাব বা চরম মিথ্যুকের রেওয়ায়েত। তাই তা একটি জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা। কেননা, এর বর্ণনাসূত্রে 'মুআল্লা ইবনে হেলাল' নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের দৃষ্টিতে সে মোটেও নির্ভরযোগ্য ছিল না; বরং মাতরূক ও মুত্তাহাম তথা পরিত্যাজ্য ও মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং হাদীস জালকারী হিসাবে পরিচিত ছিল। তাঁর সম্পর্কে হাদীস বিশারদ ইমামদের কিছু মন্তব্য নিচে উল্লেখ করা হল—

১. আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. (১৮১ হি.) বলেন, মু'আল্লা

(ইবনে হেলাল) হাদীস জাল করে।

عِنْدَنَا شيخ وهو أَبُو عصمة نوح بْن أَبِي مريم يضع كما يضع مُعَلى.

-আত তারীখুল কাবীর ৭/৩৯৬, জীবনী নং ১৭২৭

তিনি আরো বলেন, মু'আল্লা ইবনে হেলাল যতক্ষণ হাদীস বর্ণনা না করে ততক্ষণ কোনো সমস্যা নেই। কেননা সে হাদীস বর্ণনা করলে মিথ্যা বলে।

الْمُعَلّى بْنُ هِلَالٍ لَا بَأْسَ بِهِ ما لم يجيء بالْحَدِيث، فَإِنّهُ يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ.

-আল মারিফা ওয়াত তারীখ, ইমাম ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান ৩/১৩৭

২. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রাহ. (১৯৮ হি.) একবার মু'আল্লা ইবনে হেলালকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

إن هذا من أكذب الناس.

নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি চরম মিথ্যাবাদীদের একজন। -তাহযীবুল কামাল ৭/১৮০

আবু নুয়াইম বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ-এর সাথে ছিলাম। ইত্যবসরে তিনি মু'আল্লা ইবনে হেলালকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনলেন। অতপর তিনি আমাদের বললেন—

يا أبا نعيم! يكذب

হে আবু নুয়াইম! সে মিথ্যা বলছে। -তারীখু আবি যুরআ দিমাশকী, পৃষ্ঠা ৪৭১

ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহ. আরো বলেন, 'সে চরম মিথ্যাবাদী'। -কিতাবুল মাজরুহীন ৩/১৭

৩. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রাহ. (২৩৩ হি.) বলেন, মু'আল্লা ইবনে হেলাল চরম মিথ্যাবাদী।

المعلى بن هلال كذاب.

-তারীখু ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, জীবনী নং ৩৫২৫; আযযুআফাউল কাবীর ৬/৬২; আলজারহু ওয়াত তা'দীল ৮/৩৩২

তিনি আরো বলেন, মিথ্যা বলা এবং হাদীস জাল করার ক্ষেত্রে যাদের পরিচিতি আছে তাঁদের অন্যতম হল, মু'আল্লা ইবনে হেলাল।

من المعروفين بالكذب ووضع الحديث معلى بْن هلال.

-আলকামিল ফি যুআফাইর রিজাল ৮/১০০

৪. ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রাহ. (২৩৪ হি.) বলেন, 'আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তানকে কখনো কাউকে স্পষ্ট বাক্যে মিথ্যাবাদী বলতে শুনিনি। তবে মু'আল্লা ইবনে হেলাল এবং ইবরাহীম ইবনে আবী ইয়াহইয়ার বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা এরা উভয়েই মিথ্যা বলতো।'

ما رأيت يحيى بن سعيد يصرح أحدا بالكذب إلا معلى بن هلال وإبراهيم ابن أبي يحيى فإنهما كانا يكذبان.

-আল জারহু ওয়াত তাদীল ৮/৩৩১

ইমাম ইবনুল মাদীনী আরো বলেন-

كان يضع الحديث.

সে হাদীস জাল করত। -মীযানুল ইতিদাল ৫/২৭৭

৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. (২৪১ হি.) বলেন, মুআল্লা ইবনে হেলাল চরম মিথ্যাবাদী।

المعلى بن هلال الطحان الكوفي، كذاب.

-কিতাবুল ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল ১/৫১০

তিনি বলেন, 'মুআল্লা ইবনে হেলাল-এর হাদীস পরিত্যাজ্য। তার হাদীস জাল ও বানোয়াট।'

معلى بن هلال متروك الحديث، حديثه موضوع كذب.

-আল জারহু ওয়াত তাদীল ৮/৩৩২

৬. ইমাম আহমাদ ইবনে সালিহ রাহ. (২৪৮ হি.) বলেন, কুফা নগরীতে সাতজন চরম মিথ্যাবাদী রয়েছে। তারা হাদীস জাল করে। মুআল্লা ইবনে হেলাল এদের সর্বশীর্ষে রয়েছে।

كان بالكوفة سبعة كذابين يضعون الحديث، المعلى بن هلال من أعلاهم في الحديث.

-তারীখু আসমাইয জু'আফা ওয়াল কাযযাবীন ওয়াল মাতরূকীন, পৃষ্ঠা ৩০৩

৭. ইমাম ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব আসসাদী আলজুযাজানী রাহ. (২৫৯ হি.) বলেন, মু'আল্লা ইবনে হেলাল চরম মিথ্যাবাদী।

المعلى بن هلال كذاب.

-আহওয়ালুর রিজাল, জীবনী নং ৫৫

৮. ইমাম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ আলইজলী রাহ. (২৬১ হি.) বলেন-

معلى بن هلال كذاب.

মু'আল্লা ইবনে হেলাল চরম মিথ্যাবাদী। -তাহযীবুত তাহযীব, ১০/২১৯

৯. ইমাম আবু যুরআ রাযী রাহ. (২৬৪ হি.)-কে মুআল্লা ইবনে হেলালের সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'তার মধ্যে মিথ্যাবাদিতার সমস্যা আছে।'

سئل أبو زرعة عن المعلى بن هلال: ما كان ينقم عليه؟ قال: الكذب.

-আল জারহু ওয়াত তা'দীল ৮/৩৩১; তাহজীবুল কামাল ৭/১৮০

১০. ইমাম আবু দাউদ রাহ. (২৭৫ হি.)-কে মুআল্লা ইবনে হেলাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সে কোনো দিক থেকেই নির্ভরযোগ্য ও বিপদমুক্ত নয়।'

وَقَال أَبُو عُبَيد الآجري سألت أَبَا داود عَن معلى بْن هلال، فقال غير ثقة، ولا مأمون

-তাহযীবুল কামাল ৭/১৮০

১১. ইমাম নাসায়ী রাহ. (৩০৩ হি.) বলেন, 'মুআল্লা ইবনে হেলাল-এর হাদীস পরিত্যক্ত।'

مُعلى بن هِلَال مَتْرُوك الحَدِيث.

-কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন, পৃষ্ঠা ২৩৭, জীবনী নং ৫৬০

তিনি অন্যত্র বলেন, 'মুআল্লা ইবনে হেলাল হাদীস জালকারীদের অন্তর্গত।'

معلى بْن هلال ممن يضع الحديث.

-আলকামিল ফি যু'আফাইর রিজাল ৮/১০১

১২. ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন ইবনুল জুনাইদ রাহ. (২৯১ হি.) বলেন-

معلى بن هلال كذاب.

মুআল্লা ইবনে হেলাল চরম মিথ্যাবাদী। -তাহযীবুত তাহযীব ১০/২১৯

১৩. ইমাম ইবনে হিব্বান রাহ. (৩৫৪ হি.) বলেন-

كَانَ يروي الموضوعات عَن أَقوام ثِقَات وَكَانَ أُمِّيا لَا يكْتب، وَكَانَ غاليا فِي التَّشَيّع يشْتم أَصْحَاب رَسُول اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ بِحَال وَلَا كِتَابَة حَدِيثه إِلّا على جِهَة التَّعَجّب.

সে ছিকা রাবীদের সূত্রে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করত। সে ছিল নিরক্ষর, কট্টর শিয়া এবং সাহাবীদের গালমন্দকারী। তার হাদীস বর্ণনা করা, লেখা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। হ্যাঁ, চরম মিথ্যাচারে আশ্চর্যান্বিত হয়ে (তার মিথ্যাচারের প্রমাণ তুলে ধরার জন্য) লিখলে তা ভিন্ন কথা। -কিতাবুল মাজরূহীন ৩/১৬

১৪. ইমাম আবু আহমাদ ইবনে আদী রাহ. (৩৬৫ হি.) বলেন-

وَهو في عداد من يضع الحديث.

সে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা হাদীস জাল করে। -আলকামিল ফি যুআফাইর রিজাল ৮/১০২

১৫. ইমাম দারাকুতনী রাহ. (৩৮৫ হি.) বলেন- 'মুআল্লা ইবনে হেলাল মিথ্যা বলে।'

معلى بن هلال بن سويد الطحان، كوفي يكذب.

-কিতাবুয যুআফা ওয়াল মাতরূকীন, পৃষ্ঠা ১৮০, জীবনী নং ৫০৬

তিনি অন্যত্র বলেন, সে হাদীস জাল করে। -সুআলাতুল হাকিম লিদদারাকুতনী ২৫৯

প্রশ্নোক্ত বর্ণনাটির রাবী (বর্ণনাকারী) মু'আল্লা ইবনে হেলাল সম্পর্কে উপরে কয়েকজন হাদীস বিশারদ ইমামের উক্তি উল্লেখ করা হল। সকলের কথা উল্লেখ করতে গেলে এই তালিকা আরো দীর্ঘ হয়ে যেত। দেখুন, তাহযীবুল কামাল ৭/১৮০; তাহযীবুত তাহযীব ১০/২১৮,২১৯; মীযানুল ই'তিদাল ৫/২৭৭

বলা যায় উপরোক্ত বর্ণনাটির রাবী মু'আল্লা ইবনে হেলাল-এর মিথ্যাবাদী হওয়ার বিষয়ে ইজমা রয়েছে। এ কারণেই হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ. (৭৪৮ হি.) বলেন-

مُعلى بن هِلَال الْكُوفِي الطّحّان عَن مَنْصُور كَذّاب وَضاع بِاتِّفَاق.

মু'আল্লা ইবনে হেলাল সর্বসম্মতিক্রমে একজন চরম মিথ্যাবাদী ও হাদীস জালকারী। -আল-মুগনী ফিয যু'আফা, ২/৬৭১, জীবনী নং ৬৩৬২

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (৮৫২হি.) বলেন-

اتفق النقاد على تكذيبه.

অর্থাৎ মুআল্লা ইবনে হেলাল-এর মিথ্যাবাদী হওয়ার বিষয়ে সমস্ত হাদীস বিশারদ ইমাম একমত পোষণ করেছেন। -তাকরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠা ৫৭০, জীবনী নং ৬৮০৭

হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা সম্পর্কে যাদের সামান্যতম ধারণা আছে তারা জানেন এই ধরনের রাবীর বর্ণনাকে 'মাওযু' তথা জাল বলা হয়। একারণেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. বলেছেন-

كل أحاديثه موضوعة.

অর্থাৎ মুআল্লা ইবনে হেলাল-এর বর্ণিত সকল হাদীস জাল। -মীযানুল ইতিদাল ৫/২৭৭

সারকথা : প্রশ্নোক্ত রেওয়ায়েত জাল ও ভিত্তিহীন। সুতরাং হযরত উমর রা.-এর দিকে সম্বন্ধ করে উপরোক্ত কথা বর্ণনা করা কোনোভাবেই বৈধ নয়।

উপরন্তু এর সাথে তালীম ও অন্যান্য দ্বীনী খেদমতের জন্য নিজেকে ফারেগকারী বা নির্ধারিত সময় প্রদানকারীদের বেতন-ভাতা ও সম্মানীর বিষয়টি যুক্ত করা আরো অন্যায়। এ রেওয়ায়েতটি যদি সহীহও হত তবুও এমন করা যেত না। কারণ, এতে এ বিষয়টি আলোচনায়ই আসেনি। কোথায় ইলম আর কুরআনের মূল্য নেওয়া আর কোথায় মুআল্লিম ও দ্বীনের খাদেমদের সম্মানী প্রদান বা সম্মানী গ্রহণ! দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। লম্বা আলোচনায় না গিয়ে এখানে শুধু এতটুকু জেনে রাখুন যে, হযরত উমর রা. নিজেই দ্বীনের খাদেমদের বেতন-ভাতা প্রদান করতেন। কেউ না নিতে চাইলে তাকে নিতে উদ্বুদ্ধ করার ঘটনাও আছে। অন্য আমীরুল মুমিনীনদের তরীকাও তাই ছিল।

কুরআনের মূল্য নেওয়া অন্য জিনিস। সেটা হল অর্থের বিনিময়ে কুরআন বিকৃত করা। শরীয়তের বিধান বিকৃত করা বা দ্বীন ও শরীয়তের বিষয়ের রিশওয়াত গ্রহণ করা। এটা তো সম্পূর্ণ হারাম ও অনেক হীন কাজ। তা হারাম হওয়ার বিষয়ে খোদ কুরআনে কারীমই (২ : ৪১) সতর্ক করেছে (মাআরেফুল কুরআন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৭)। এটার জন্য এই জাল বর্ণনার পিছে পড়ার দরকার নেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য-১ :

উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি হাফেয আবুল আব্বাস আলমুসতাগফিরী রাহ. (৪৩২ হি.) তাঁর কিতাব 'ফাযায়েলুল কুরআনে' অভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই কিতাবের মুদ্রিত কপিতে সনদের মধ্যে 'মুআল্লা ইবনে হেলাল'-এর পরিবর্তে 'আলা ইবনুল হেলাল' লেখা আছে। এটা এই কিতাবের পাণ্ডুলিপি এডিটকারীর অসতর্কতাজনিত ভুল। তিনি হয়ত পাণ্ডুলিপির পাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হননি বা লিপিকারের ভুল বুঝতে পারেননি। কেননা লাইছ ইবনে আবী সুলাইম থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের তালিকায় 'মুআল্লা ইবনে হেলাল'-এর নাম পাওয়া যায়, 'আলা ইবনে হেলাল'-এর নাম পাওয়া যায় না। (দেখুন : তাহযীবুল কামাল) ত্ববাকার বিচারেও 'লাইছ ইবনে আবী সুলাইম থেকে আলা ইবনে হেলাল-এর বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বিষয়টি পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য এই কিতাবের একটি পাণ্ডুলিপির চিত্র প্রবন্ধের শেষে তুলে ধরা হল।[১]

এই পাণ্ডুলিপি জামিআ ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় সংরক্ষিত আছে। সুতরাং বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য-২ :

উপরোক্ত রেওয়ায়েত-এর মধ্যে শব্দটি কি যুনাত (الزناة) না দুনাত (الدناة) ? (যুনাত এর বাংলা অর্থ যিনাকারীরা, আর দুনাত এর বাংলা অর্থ নিকৃষ্ট লোকেরা।)

খতীবে বাগদাদী রাহ.-এর কিতাবে শব্দটি যুনাত নয়; বরং দুনাত এসেছে। আমরা খতীবে বাগদাদী রাহ.-এর কিতাবের মোট চারটি এডিশন দেখেছি, যথা :

১. ড. মাহমুদ ত্বহ্হান-এর তাহকীক-সম্পাদনায় রিয়াদ-এর মাকতাবাতুল মা'আরিফ থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।

২. ড. আজাজ খতীবের তাহকীক-সম্পাদনায় বৈরুত-এর মুআসসাসাতুর রিসালা থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।

৩. ড. মাহির ইয়াসীন আলফালাহ-এর তাহকীক-সম্পাদনায় প্রকাশিত সংস্করণ।

৪. আবু আবদুর রহমান সালাহ ইবনে মুহাম্মাদের তাখরীজসহ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।

এই চারটি সংস্করণেই শব্দ হচ্ছে 'দুনাত'। কোনোটার মধ্যেই 'যুনাত' শব্দটি নেই। এছাড়াও খতীবে বাগদাদী রাহ.-এর কিতাবের দুটি পাণ্ডুলিপি আমরা দেখেছি। সেখানেও 'দুনাত' শব্দ আছে, 'যুনাত' শব্দটি নেই। প্রবন্ধের শেষে পাণ্ডুলিপি দুটির চিত্র তুলে ধরা হল। [২-৩]

প্রথম পাণ্ডুলিপি মিসর-এর ইসকানদারিয়ার আলমাকতাবাতুল বালাদিয়াতে সংরক্ষিত আছে। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারাতে সংরক্ষিত আছে।

সুতরাং খতীবের উদ্ধৃতিতে 'কানয'সহ কিছু কিতাবে যে এই বর্ণনায় 'যুনাত' শব্দ রয়েছে এর কোনো ধর্তব্য নেই। কারণ, তা মূলের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। অবশ্য হাফেয মুসতাগফিরী রাহ.-এর কিতাবে 'যুনাত' শব্দ এসেছে। যেহেতু খতীব আর তাঁর মুল সনদ এক, এতে বুঝা যায় যে মুসতাগফিরীর কিতাবে 'যুনাত' শব্দটি বিকৃত। মূল শব্দ 'দুনাত'। তা যাই হোক এতে তেমন কিছু আসে যায় না। কেননা মূল বর্ণনাই তো মওযু ও ভিত্তিহীন। সুতরাং এই শব্দ হোক আর ঐ শব্দ হোক কোনোভাবেই এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার সুযোগ নেই।

কয়েকজন মুহাদ্দিসের কিতাবে এই জাল বর্ণনা কীভাবে এসেছে?

আপনি জানতে চেয়েছেন এই রেওয়ায়েত যদি মওযু হয়ে থাকে, তবে একাধিক আলেমের কিতাবে এই বর্ণনা কীভাবে এল? অথচ তারাও ইলমে হাদীসের সাথে সম্পর্ক রাখতেন।

প্রথম কথা হল : খতীবে বাগদাদী রাহ. এবং হাফেয মুসতাগফীরী রাহ. এই রেওয়ায়েত-এর পূর্ণ সনদ উল্লেখ করে দিয়েছেন। আর সাধারণত মুহাদ্দিসীনে কেরামের নীতি হল, তাঁরা যখন কোনো রেওয়ায়েত-এর সনদ তুলে ধরেন তখন তারা এই বর্ণনার বিষয়ে দায়মুক্ত হয়ে যান। কেননা সনদের দ্বারাই এই রেওয়ায়েতের শুদ্ধাশুদ্ধির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা যাহিদ কাওছারী রাহ. বলেন—

> "যে সকল মুফাসসিরীন এবং মুহাদ্দিসীন মওযু ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং নীরবতা পালন করেছেন, তাদের এই কর্মপন্থা দলীল নয় যে, এই রেওয়ায়েত তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য। কেননা তারা যখন কোনো মিথ্যা বর্ণনার সনদ উল্লেখ করে দেন, তখন তারা একে দায়মুক্তি হিসেবে গণ্য করেন। কেননা সনদের মধ্যেই ঐ বর্ণনা বাতিল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট থাকে। যারা এর বিপরীত দাবি করবে তাঁরা হয়ত এই বিষয়ে অজ্ঞ অথবা মিথ্যাচারিতায় লিপ্ত।" -মাকালাতুল কাওছারী, পৃষ্ঠা ৩১২, ৪৬১

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.ও এই উসূল ও নীতি উল্লেখ করেছেন। (দেখুন, লিসানুল মিযান ৪/১২৮)

সুতরাং কোনো মুহাদ্দিসের এমন কিতাবে যেখানে তিনি শুধু সহীহ হাদীস আনার শর্ত করেননি সেখানে কোনো রেওয়ায়েত দেখলেই একথা মনে করার সুযোগ নেই যে, তিনি একে সহীহ মনে করতেন; বরং সনদের বিচারে ঐ বর্ণনার মান নির্ণয় করতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হল, খতীবে বাগদাদী রাহ.-এর রচনাবলীতে মুনকার ও মওযু বর্ণনা ব্যাপকভাবে চলে আসে। অথচ তিনি এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করে নীরব থাকেন। হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ. এই বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন—

أَحْمد بن عَلِيّ بن ثَابت الْحَافِظ ابو بكر الْخَطِيب تكلم فِيهِ بَعضهم، وَهُوَ وَأَبُو نعيم وَكثير من عُلَمَاء الْمُتَأَخِّرين لَا أعلم لَهُم ذَنبا أكبر من روايتهم الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة فِي تأليفهم، غير محذرين مِنْهَا.

খতীবে বাগদাদী, আবু নু'আইম এবং পরবর্তী অনেকের একটি বড় অন্যায় হল, তাঁরা তাদের রচনাবলীতে মওযু ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, কিন্তু কোনোরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন না। -আর রু'আতুছ ছিকাত আলমুতাকাল্লাম ফীহিম বিমা লা ইউজিবু রাদ্দাহুম। পৃষ্ঠা ৮৪

সুতরাং খতীবে বাগদাদী রাহ. বা এই নিয়ম অবলম্বনকারী কোনো মুহাদ্দিসের কিতাবসমূহে কোনো বর্ণনা দেখলেই একে নির্দ্বিধায় সহীহ মনে করা ভুল।

খতীবে বাগদাদী রাহ.-এর সূত্রে জালালুদ্দিন সুয়ূতী রাহ. তাঁর কিতাব 'আলজামিউল কাবীর'-এ উপরোক্ত রেওয়ায়েত নকল করেছেন। সুয়ূতী রাহ.-এর ইচ্ছা ছিল, বিভিন্ন কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে থাকা সবধরনের বর্ণনাগুলোকে কওলী ও ফে'লী দু-ভাগে ভাগ করে এই কিতাবে সংকলিত করা। সে হিসেবে এই কিতাবে সহীহ, হাসান ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে যয়ীফ, মুনকার ও মওযু রেওয়ায়েত এসেছে। আর 'কানয' অর্থাৎ আলী মুত্তাকী রাহ.-এর 'কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফআল' কিতাবটি মূলত হাফেয সুয়ূতী রাহ.-এর তিনটি কিতাবের অধ্যায়ভিত্তিক সুবিন্যস্ত রূপমাত্র। সুয়ূতী রাহ.-এর তিনটি কিতাব হল—

১. আলজামিউল কাবীর
২. আলজামিউস সগীর
৩. যিয়াদাতুল জামিউস সগীর।

কানযুল উম্মাল-এ এই তিনটি কিতাবকে ফিকহী অধ্যায় অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে মাত্র। অতএব স্বাভাবিকভাবেই সুয়ূতী রাহ.-এর তিন কিতাবের যয়ীফ, মওযু ও মুনকার রেওয়ায়েতসমূহ কানযুল উম্মাল-এ হুবহু রয়ে গেছে। তাই কোনো বর্ণনা 'কানযুল উম্মাল' কিতাবে থাকলে তাকে সহীহ মনে করার কোনো উপায় নেই। মূল উৎসগ্রন্থ থেকে সনদ যাচাই করে বিষয়টা নিশ্চিত হতে হবে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রা.-এর সাথে সম্বন্ধ করে যে কথাটি 'কানয'-এর উদ্ধৃতিতে আজকাল খুব চর্চা করা হচ্ছে আমরা দেখলাম তার সনদও একেবারেই বাতিল। তাতে রয়েছে মুয়াল্লা ইবনে হিলাল-এর মতো প্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী। আর সে-ই কথাটি হযরত উমর রা.-এর নামে চালিয়ে দিয়েছে।

মনে রাখবেন, হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রাহ.-এর পক্ষে যেহেতু এর সনদ যাচাই করার সুযোগ হয়নি তাই তিনি মাযূর। কিন্তু এখন যেহেতু সনদ যাচাই করে আসল হাকীকত উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাই বিষয়টি জানার পরও যদি কেউ এই কথাটি বর্ণনা করতে থাকে সে মাযূর হবে না; বরং গোনাহগার হবে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহ. লিখেন—

"যদি প্রবল সুধারণার কারণে কারোর সন্দেহই না হয় যে, বর্ণনাকারীরা ভুল বা মিথ্যা বর্ণনা করেছে, তাহলে তাকে দোষারোপ করা যাবে না। কোনো কোনো বুযুর্গের ক্ষেত্রে এরূপই ঘটেছে। এভাবেই তাদের বাণী ও লেখায় কিছু ভিত্তিহীন হাদীসের অনুপপ্রবেশ ঘটেছে। তবে যদি উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক করার পরও কেউ ওই ধরনের হাদীস বর্ণনায় অটল থাকে, যেমনটি অধিকাংশ জাহেলদের অভ্যাস, তাহলে তাকে দোষমুক্ত মনে করার কোনো অবকাশ নেই।" -আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ, পৃ. ৪০৩

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহ. এবং নিযামুদ্দিন মারকাযের উস্তাযগণের মাদরাসা থেকে অযীফা গ্রহণ

আপনি সর্বশেষ জানতে চেয়েছেন যে, দ্বীনী কাজে আবদ্ধ থাকার দরুণ উলামায়ে কেরাম মাদরাসায় যে অযীফা গ্রহণ করেন, এ বিষয়ে শরীআতের বিধান কী?

এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ভিন্ন প্রবন্ধ প্রয়োজন। এখন সংক্ষেপে শুধু এতটুকু জেনে রাখুন-

> ১৭ই শাওয়াল ১৩২৮ হিজরী মোতাবেক ২১ অক্টোবর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহ. সাহারানপুর-এর মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার উস্তায হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেই সময় তাঁর অযীফা ধার্য করা হয় ১৩ রূপি। প্রায় সাত মাস পর ১৩২৯ হিজরীর জুমাদাল আখিরাহ মাসে আরো দু'রূপি ওযীফা বৃদ্ধি করা হয়। (দেখুন সাওয়ানেহে হযরতজী ছালেছ, সাইয়িদ মুহাম্মদ শাহেদ সাহারানপুরী ১/২০)
>
> স্বয়ং মাওলানা ইলিয়াস রাহ. নিযামুদ্দিন মারকাযে অবস্থিত মাদরাসা কাশিফুল উলূমে উস্তাযদের অযীফা দিতেন। কোন উস্তাযকে কত দিবেন এই বিষয়ে শায়েখ যাকারিয়া রাহ. থেকে পরামর্শ নিতেন। (দেখুন, আপবীতি ৪/১৩৯-১৪০, ধারাবাহিক নম্বর : ৫১০-৫১১, অধ্যায়-৫, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রাহ.-এর আলোচনা)
>
> মেওয়াতিদেরকে মাওলানা ইলিয়াস রাহ. বলতেন, 'তোমরা মকতবে সন্তানদের পড়তে পাঠাও। শিক্ষকদের অযিফা আমি জোগাড় করব।' (দ্বীনী দাওয়াত, পৃষ্ঠা ৭৯)

আল্লাহ আমাদেরকে সবধরনের প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত হয়ে দ্বীনী খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

১. ফাযায়েলুল কুরআন, মুসতাগফিরী-এর পাণ্ডুলিপি থেকে। সূক্ষ্মভাবে দেখুন, এতে (অন্য রসমুল খতে) "المعلا" লেখা রয়েছে।
২, ৩. খতীব রাহ.-এর কিতাবের দুটি পাণ্ডুলিপি। উভয়টিতেই রয়েছে- "المعلى بن هلال" এবং "الدناة"।
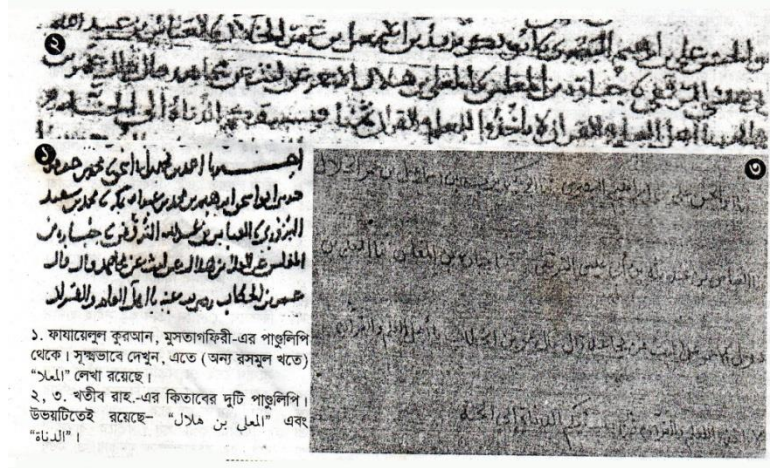
সমাপ্ত

মাওলানা সাদ সাহেবকে নিয়ে কেন এই বিতর্ক?
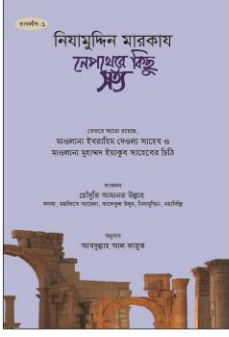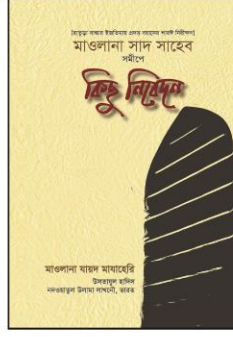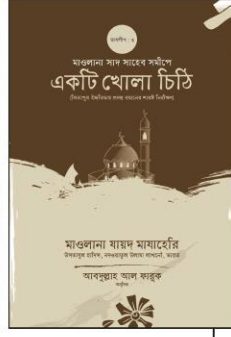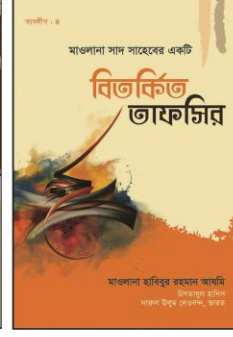
মূল্য : ৮০/-

মূল্য : ৪০/-

মূল্য : ৭০/-

মূল্য : ৬০/-

মূল্য : ৫০/-

মূল্য : ৮০/-

মূল্য : ১৪০/-

মূল্য : ২৬০/-

মূল্য : ৮০/-

মূল্য : ১৬০/-

মূল্য : ৪০/-

মূল্য : ১৪০/-

মূল্য : ১০০/-

মূল্য : ১২০/-

মূল্য : ৪০/-

মূল্য : ২০০/-

পুরো সিরিজটির মুদ্রিত মূল্য : ১৭২০ টাকা।
বইগুলো পুরো বাংলাদেশে কুরিয়ার ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে।
সিরিজের যে কোনো বই পেতে ফোন দিন,
০১৮ ৪২ ১২ ২২ ২৫
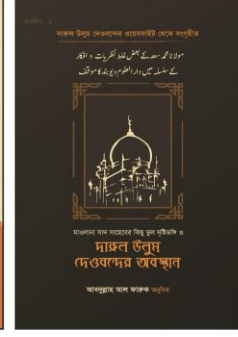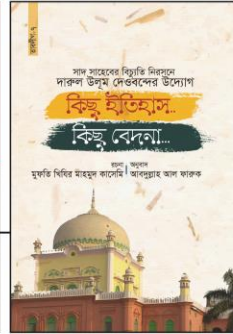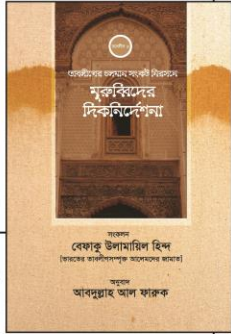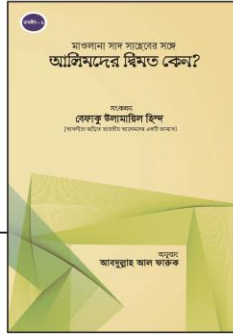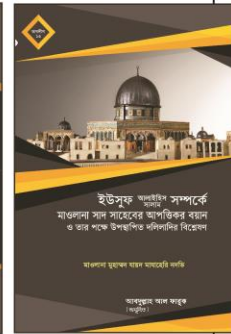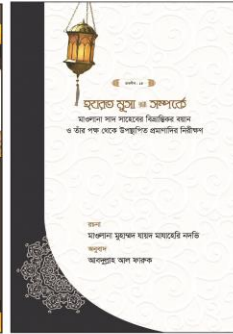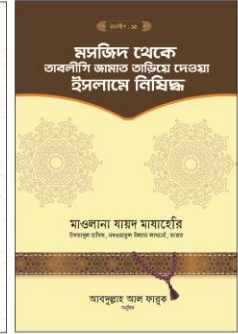
ইজতিমা ময়দানে সংঘাত — সাথীদের উদ্দেশে কিছু কথা
মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি
অনুবাদ আবদুল্লাহ আল ফারুক
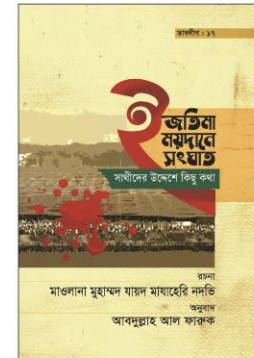
মূল্য : ৬০/-

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আসআদ
আশুলিয়া, ঢাকা
015 11 52 50 70

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার
মধ্যবাড্ডা। বাংলাবাজার। যাত্রাবাড়ি
019 24 07 63 65